নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল।

লেখক স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদগণের মধ্যে বহুজনকে দর্শন করিবার এবং কয়েকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার, এমনকি সেবা করিবারও দুর্লভ সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সব দিনের স্মৃতিকথাগুলি তিনি গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

লেখাগুলি প্রায় সবই পূর্বে 'উদ্বোধন', 'বিশ্ববাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থরূপে প্রকাশকালে সেগুলি সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র, লেখক কোথাও কোথাও সামান্য কিছু সংযোজনও করিয়াছেন।

লেখার সাবলীল ভঙ্গি গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। আশা করি গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পাঠকচিত্তেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সান্নিধ্যের স্পর্শ কিছুটা দিবে এবং সেখানেই লেখকের এবং আমাদের শ্রমের সার্থকতা।

প্রকাশক

১২ জানুআরি
১৯৭৭

সূচীপত্র

স্বামী প্রেমানন্দ

খুব সম্ভব ১৯১৫ সালে আমি সর্বপ্রথম বেলুড় মঠ দর্শন করি। তখন আমি কলিকাতায় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম। ইতঃপূর্বে গ্রামের স্কুলে পড়িবার সময় কিছু কিছু স্বামীজীর বই পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু যে শিক্ষক এই বইগুলি আমায় প্রথম পড়িতে দেন তিনি আমাকে উহা অতি গোপনে পড়িতে বলেন। তৎপূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন আমাদের কৈশোর অতিক্রম না করিলেও আমরা উহাতে কিছু কিছু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়া গৌরব বোধ করিতাম। এবং এই দেশ হইতে বিদেশী শাসন দূর না হইলে যে আমাদের উন্নতি একেবারেই সম্ভব নহে প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করিতাম। তাই স্বামীজীর পুস্তকগুলি ঐরূপ গোপনে পড়িয়া মনে হইয়াছিল যে তিনিও একজন সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন ও তাঁহার শরীর থাকিলে তিনিও যে একজন রাজনৈতিক বিপ্লবী নেতা হইতেন ইহাও নিঃসন্দেহে তখন মনে দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলাম। আবার সেই সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসিয়া কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত কোন কোন শিক্ষকের বা ভদ্রলোকের নিকট মাঝে মাঝে শুনিতাম যে স্বামীজীর স্থাপিত বেলুড় মঠটিও সাহিত্যিক বঙ্কিমবাবু বর্ণিত আনন্দ-মঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানের সাধুরাও গোপনে গোপনে ইংরাজ-বিতাড়নের জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিতেছেন। শুনিয়া মনে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু গ্রামের স্কুল হইতে পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিবার পর সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে স্বামীজী ও তাঁহার স্থাপিত বেলুড় মঠ বিষয়ে কোন কিছু জানিবার আগ্রহই আর মনে উঠে নাই। প্রথমে একটি ব্রাহ্ম কলেজে ও পরে একটি ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্তি হইয়াছিলাম, যেখানে

ঐরূপ আলোচনা করিবার কোন সুযোগই ছিল না। কলিকাতায় যে বাসায় থাকিতাম সেখানকার অভিভাবকেরাও তাঁহাদের ব্যবসাদি লইয়া সর্বদা ব্যস্ত থাকায় স্বামীজী ও বেলুড় মঠ বিষয়ে কোন কথাই তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিতে পাইতাম না।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তৃতীয় বৎসরে (১৯১৫ খৃঃ) হঠাৎ আমার এক সমবয়সী যুবক আসিয়া বলিলেন, "আজ বৈকালে পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে বেলুড় মঠে স্বামীজী-বিষয়ে একটি সভা হইবে। ইচ্ছা করিলে তুমিও আমার সঙ্গে সেখানে যাইতে পার।" তাঁহার কথায় তখনই সম্মত হইলাম ও সেখানে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় ঐ বাড়ীতে নবাগত একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "তোমরা যখন বেলুড় মঠে যাইতেছ তখন আমাকেও তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল। আমার একটি পুত্র সেখানে ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থান করিতেছে।" শুনিয়া আমাদের আনন্দ হইল ও যথাসময়ে আমরা তাঁহাকে লইয়া বেলুড় মঠের দিকে রওনা হইলাম।

সভা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্বে আমরা সেখানে উপস্থিত হইলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বেলুড় মঠের বহু সাধুর পূর্বপরিচিত বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। আমরাও ইতোমধ্যে মঠের সমস্ত প্রাঙ্গণটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমাদের পূর্বে ধারণা ছিল যে মঠটি কোন চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের মত হইবে। কিন্তু দেখিলাম মাত্র সেখানে দুইটি বাড়ী রহিয়াছে। একটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘর ও দ্বিতীয়টিতে সাধুরা থাকেন। ইহা ব্যতীত আর কোন মন্দির সেখানে তখনও হয় নাই। নিকটে দক্ষিণে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ পড়িয়া আছে মাত্র। দেখিয়া মনে হইল তবে কি কাগজে 'বেলুড় মঠ' লিখিয়া যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল উহাতে কিছু ভুল ছিল? খুব সম্ভব 'বেলুড় মাঠে'র বদলে উহাতে 'বেলুড় মঠ' ছাপা হইয়াছে।

যথাসময়ে সভার কার্য আরম্ভ হইল। সভার একপাশে স্বামীজীর পরিব্রাজক-মূর্তির একটি বৃহৎ ছবি সাজান হইয়াছিল। ছবিটি দেখিয়া খুবই ভাল লাগিল। মনে হইল যে এইরূপ সন্ন্যাসীই তো চাই, যিনি কপর্দক-শূন্য অবস্থায় ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডালের গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিয়া ভারতের যথার্থ মর্মকথা অবগত হইয়াছেন। সভার প্রারম্ভে আমাদের সহপাঠী দয়াময় মিত্র (ভুলু বাবু) স্বামীজীর 'Song of the Sannyasin' কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন। তখনও তিনি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা-প্রাপ্তা যোগীনমার দৌহিত্র ও উদ্বোধনেই অবস্থান করেন তাহা জানিতাম না। সুতরাং তাঁহাকে অতগুলি সন্ন্যাসীর মধ্যে দাঁড়াইয়া ঐরূপ আবৃত্তি করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ ভাবই মনে উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক সভা আরম্ভ হইল ও পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতির পক্ষ হইতে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি নাতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। উহা পড়িতে পড়িতে যখন তিনি স্বামীজীর চিকাগোর বক্তৃতা বিষয়ে আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে সত্য সত্যই সেদিন চিকাগোর সভায় ঈশানের বিষাণ বাজিয়াছিল, ঐ কথা শুনিয়া সেই সময়, এখনও মনে পড়ে, আমাদের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম—ঠিকই তো, সেই বিশ্বসভায় কে আর এই পরাধীন ভারতের মর্মকথা ঐরূপে উদ্‌ঘাটন করিয়াছে? কে আর বলিয়াছে ভারত এখনও জীবিত? কে বা বলিয়াছে তাঁহার এই ধর্মের শাশ্বত বাণীই সমগ্র বিশ্বকে একদিন প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবে?

সভা ভঙ্গ হইল ও আমরা যখন ফিরিয়া আসিতে উদ্যোগ করিতেছি, তখন একটি নাতিকৃশ গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী আসিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ না পাইয়া কেহ যেন সভাস্থল পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার এই সবিনয় অনুরোধ আমাদের নিকট কিছু নূতনই ঠেকিয়াছিল।

কেননা কলিকাতার অন্য কোন সভাস্তে এইরূপ কিছু তো দেখি নাই। পরে শুনিলাম যে তিনিই বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দ, যাঁহার প্রেমের আকর্ষণে বহু ভক্ত ও শিক্ষিত যুবকগণ প্রতিদিনই মঠে আসিয়া সমবেত হইতেছেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছেন।

ইহার পর আর দুই বৎসর যাবৎ মঠের দিকে আসি নাই। মঠের ও পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের স্মৃতি মন হইতে একরূপ চলিয়া গিয়াছিল। *ইহার পরে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে-* ছিলাম তখন একদিন আমাদের পূর্ব-পরিচিত বন্ধু নীরদ সান্যাল, যিনি পরে স্বামী অখিলানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "ভাই, আজ আমরা কয়েকজন বন্ধু একটি সুন্দর জায়গায় যাইতেছি, তুমিও আমাদের সহিত চলো।" নূতন স্থান দেখিবার প্রলোভনে তাঁহার সহিত যাইতে রাজি হইলাম ও হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে আসিয়া দেখি আমাদেরই সহপাঠী শ্রীঅনঙ্গ নিয়োগী, জিতেন বিশ্বাস ও দ্বিজেন চৌধুরী নামক আরও কয়েকটি যুবক আমাদের জন্য যেন সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন (ইঁহারাই পরজীবনে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী ওঁকারানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী বিবিদিষানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন)। ইঁহারা যে অবকাশ সময়ে প্রায়ই বেলুড় মঠে যাতায়াত করেন তাহা জানিতাম না। যাহা হউক যথাসময়ে আমরা লিলুয়া স্টেশনের টিকিট কাটিলাম। সকলে পথে নানা বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তখনও যে আমরা বেলুড় মঠে যাইতেছি একথা উঁহাদের কাহারও মুখে শুনিতে পাই নাই। উহার পূর্বদিনে পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে প্রায় ৬০টি বাড়ীতে রাজনৈতিক কারণে খানাতল্লাসি হইয়াছিল। ঐ বিষয়েই বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছিল। তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঐরূপ অত্যাচারের কথাই আমাদের ঐ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল।

দেখিতে দেখিতে আমরা বেলুড় মঠের পুরাতন গেটে (সদর দরজার নিকটে) পৌঁছিলাম। তখনও যে উহা বেলুড় মঠেরই সদর দরজা তাহা জানিতাম না। কিন্তু দেখিলাম যে, বন্ধুগণ উহার নিকটে আসিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং উঁহাদের একজন বলিলেন যে, এখন চুপ কর। আমরা পরমতীর্থ বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়াছি। ইতঃপূর্বে আমাদের সকলকে উঁহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, "আচ্ছা বলতো রাজনীতি বড়, না ধর্ম বড় ?" উঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই বলিলেন যে, ধর্মই বড়। আমি তখন উগ্র রাজনীতির সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়াছি। কাজেই উঁহাদের ঐরূপ উত্তর আমার মোটেই ভাল লাগিল না। ভাবিলাম উহা উঁহাদের দুর্বলতার চিহ্ন। কাজেই আমি উঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, "যে ধর্ম বর্তমান রাজনীতির সহিত সংস্পৃষ্ট নহে, আমি তাহাতে বিশ্বাস করি না। দেশের মুক্তিই প্রথম আবশ্যক। তবে উহার সহিত ধর্ম না থাকিলে, উহা বিপথে চালিত হইতে পারে। কাজেই ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ই একত্রে চালানো আবশ্যক।" বন্ধুগণ এতক্ষণ আমার মনের অবস্থা যে যাচাই করিতেছিলেন—তাহা বুঝি নাই। আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া উঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, উহার কথাই ঠিক। উভয়টিই আমাদের একত্রে চালানো উচিত।" উহা যে আমারই মনঃপূত কথার সম্মতিমাত্র তাহা কিছু পরেই জানিতে পারিলাম।

মঠের বিস্তীর্ণ মাঠ পার হইয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের নিকটে পৌঁছিলাম। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া বন্ধুগণ সকলেই ভক্তিভরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। আমিও তাহাই করিলাম।

নীচে নামিয়া দেখি একটি বেঞ্চে সেই পূর্বপরিচিত নাতিকৃশ গৌরবর্ণ সাধুটি বসিয়া আছেন। পরে জানিলাম যে, তিনিই শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দজী। তাঁহার চারিদিকে কতিপয় ভক্ত উপবিষ্ট। আমরাও

তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম ও ঐ ভক্তদের মধ্যে একটু স্থান করিয়া বসিলাম। ইতঃপূর্বে তাঁহারা কি আলোচনা করিতেছিলেন জানি না। কিন্তু আমাদের দেখিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক একটি ভক্ত (যাঁহার কথা পরে জানিয়াছিলাম যে, তিনি কলিকাতার মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তাঁহার তর্কস্পৃহার জন্য ভক্তগণ তাঁহাকে Hegel বলিয়া ডাকিতেন) হঠাৎ সেই সাধুটিকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ এই দেখুন আজ দেশের যুবকগণ কি লইয়া মাতিয়া আছে। ইহারা দেশের জন্য তাহাদের কাঁচা মাথা বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আর আপনারা এখানে বসিয়া কি করিতেছেন? কেবল খিচুড়ি খাওয়াইতেছেন আর ঠাকুরের নাম প্রচার করিতেছেন। ইহাই কি বর্তমান ধর্ম?" পূজনীয় মহারাজ ইহা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। উহার নিকটেই একটি দরজার উপরে স্বামীজীর বীরবেশ ছবিটি (যে বেশে তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রথম বক্তৃতা দেন) টাঙ্গানো ছিল, উহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ তো, যদি তোমাদের দেশের রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর কি ইঁহাকে একটি ঐরূপ নেতা করিয়া তোমাদের নিকটে পাঠাইতেন না? তাহা না করিয়া ইঁহাকে তিনি করিলেন কি? করিলেন কিনা একটি কপর্দকহীন কৌপীনধারী সন্ন্যাসী মাত্র। উহা দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না যে, তোমাদের দেশের কি প্রয়োজন? বা তোমাদের কি আদর্শ হওয়া উচিত?" কিন্তু হিগেলও ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন, "কিন্তু যাহাই বলুন উঁহার হাতে কি কমণ্ডলু সাজে—না উঁহার কোমরে একখানি তরবারি ঝুলিলেই ঠিক ঠিক মানাইত?" বাবুরাম মহারাজ উহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু বলিতে লাগিলেন, "হরিবোল" "হরিবোল"। হিগেলও বলিলেন, "ঐতো আপনার এক কথা, যখনই কোন গোলমালে পড়েন তখনই বলেন, "হরিবোল"

"হরিবোল"। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ ও কথার আর কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার সেই দিব্যভাবোদ্দীপ্ত মূর্তিতে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এই ক্ষুদ্র কথাটি মনে হয় অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়ে প্রথম ধর্মের বীজ বপন করিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ নামিবার একটি ঘণ্টা পড়িল। বাবুরাম মহারাজ সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে ভক্তরা এসেছে, প্রসাদ দে, প্রসাদ দে।" এইরূপে সকালে দুইবার, মধ্যাহ্নে একবার ও যতদূর মনে পড়ে বৈকালে দুইবার ঐরূপ প্রসাদের ঘণ্টা পড়িয়াছিল ও শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজও প্রতিবারেই আমাদিগকে ঐরূপভাবে প্রসাদ পরিবেশন করাইলেন। আমি কিন্তু প্রতিবারই মনে মনে হাসিতে লাগিলাম ও বলিতে লাগিলাম, 'আহা কি ভক্তই না চিনিয়াছেন! ইঁহারাই আবার তীব্র বিচারশীল স্বামীজীর গুরুভাই!' বন্ধুগণ কিন্তু পরে বলিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বলেন, "আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের মাহাত্ম্য বুঝি আর না বুঝি তাঁহার প্রসাদের মাহাত্ম্য বেশ বুঝিতে পারি। উহা একবার যে গলাধঃকরণ করিয়াছে তাহার ভক্তি হইবেই হইবে।" তখন কিন্তু উহা একেবারেই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু উহার দু-তিন বৎসর পরে যখন পূজনীয় হরি মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় বেলুড় মঠে সাধু হিসাবে যোগদান করিলাম তখন মনে হইল, এতদিন পরে সত্যই তো সেই সুপ্ত বীজ হইতে ধর্মের অঙ্কুরোদ্গম হইল।

ইহার পরেও বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে আরও দু-একবার শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমি উগ্র রাজনীতি লইয়া খুবই ব্যস্ত। তাই বন্ধুগণকে সানুনয়ে বলিয়াছিলাম, "ভাই আমাকে ছেড়ে দাও। আমি দু-নৌকায় একসঙ্গে পা দিতে পারবো না। এখন আমাকে রাজনীতিতেই থাকতে দাও। পরে সময় হলে তোমাদের প্রদর্শিত ধর্মজীবন যাপন করার চেষ্টা করব।"

শ্রীভগবান বোধহয় আমার কথা অলক্ষ্যে শুনিয়াছিলেন এবং কার্যত

তাহাই হইল। ইহার কিছুকাল পরেই উগ্র রাজনীতির সংগ্রামের জন্য প্রায় বৎসরাধিককাল অন্তরীণ আদি বন্দীজীবন যাপন করিতে হয়। পরে পূজনীয় হরি মহারাজের অশেষ কৃপায় আমার ধর্মজীবন আরম্ভ হয় ও আমি মঠে যোগদান করি।

কিন্তু এই অন্তরীণবাস সময়েও মাঝে মাঝে কেন জানি না সেই অদ্ভুত, পূতচরিত্র যথার্থ প্রেমিক প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) মুখচ্ছবি আমার মনে ভাসিয়া উঠিত। অন্তরীণ হইতে বাহিরে আসিয়া যখন তাঁহার কথা বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম তখন অতি দুঃখের সহিত শুনিলাম যে, তাঁহার আর শরীর নাই।

১৯২০ সালে মঠে যোগদান করি। তখনও দেখি সমগ্র মঠ শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের ভাবে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ তখন মঠের অধ্যক্ষ হইলেও উহার প্রতিটি কার্য পরিচালনার সময় বলিতেন, "দেখ, তোমরা বাবুরাম মহারাজকে যেমনটি দেখিয়াছ ও তাঁহার যেরকম নির্দেশ পাইয়াছ তদনুযায়ী মঠের কার্যাদি পরিচালনা কর, আমার ঐ বিষয়ে আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার অপার্থিব স্নেহ তোমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করুক।" ইতোমধ্যে শুনিলাম যে সমগ্র পূর্ববঙ্গকে তিনি তাঁর প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া অকালে শরীরত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি হিন্দু ও প্রতিটি মুসলমান তাঁহাকে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মের যথার্থ নির্দেশক বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। তিনি সে অঞ্চল হইতে ফিরিবার সময় শুনিয়াছেন, চাষী মুসলমানগণও তাঁহাদের চাষ ফেলিয়া তাঁহার পালকী ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়াছিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, ওরে আমাদের পীর চলিয়া যাইতেছেন, আমাদের পীর চলিয়া যাইতেছেন, ইত্যাদি।

মঠে যোগ দিবার ২।৩ বৎসর পরে আমরা ঢাকা আশ্রমের কর্মিরূপে প্রেরিত হই। সেখানে যাইয়া অতি আশ্চর্যের সহিত দেখিতে পাইলাম

যে সেই আশ্রমের রান্নাঘরটি, যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগাদি রান্না হইয়া থাকে উহা পূর্বতন ঢাকার নবাব সাহেব আমানউল্লার দুহিতা বিবি আখতার বানু কর্তৃক 'আমান স্মৃতিমঞ্জিল' রূপে নির্মিত। উহা দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। কেননা উহার কয়েক বৎসর পূর্বেই কাগজে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে তাঁহার (আখতার বানুর) ভ্রাতা ঢাকার তদানীন্তন নবাব শলিমউল্লা সাহেবকে হস্তের ক্রীড়নক করিয়া তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ঐ অঞ্চলের হিন্দুদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম যে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজেরই অপূর্ব প্রেমের ইহা একটি কীর্তি। তিনি ঢাকায় আসিয়া হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তাঁর অদ্ভুত প্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। এমনকি হিন্দুদিগের পক্ষে প্রায় অগম্য ঢাকার নবাব-প্রাসাদে গিয়া তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমের কথা শুনাইয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দেখিলাম যে একটি বৃহৎ মোটর গাড়ীতে (তখন মোটর গাড়ী অতি দুর্লভ ছিল) আম, লিচু প্রভৃতি ভর্তি করিয়া একটি মুসলমান ভদ্রলোক মঠ-প্রাঙ্গণে নামিলেন ও বলিলেন, "এইসকল আম, লিচু প্রভৃতি বিবি সাহেবার (আখতার বানু) বাগান হইতে আসিয়াছে, তাঁহার আদেশে ; বাগানের এই পরিপক্ক ফলগুলি আপনাদের এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য নিবেদন করিতে হইবে।" বুঝিলাম ইহাও স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমের আর একটি সাক্ষ্য।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার প্রেমের আরেকটি সাক্ষ্য পাইয়া খুবই চমৎকৃত হইয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম যে স্বর্গীয় প্রেমে কি না করিতে পারে। একদিন আমরা কতিপয় বন্ধু মঠের বারান্দায় বসিয়া আছি এমন সময় ধুতি-চাদর পরিহিত সৌম্য সুন্দর একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, "দেখুন আমি আপনাদের প্রেমানন্দ স্বামীর শিষ্য।" আশ্চর্য হইয়া আমরা তাঁহাকে

বলিলাম, "তিনি তো কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। তবে আপনি কি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা পাইলেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আপনারা যাহাকে দীক্ষা বলেন, তাহা তিনি দিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার কথায় আমার জীবনে দীক্ষার কাজ হইয়াছে ও আমি সেইভাবেই আমার নিজের জীবনকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছি।" আমাদিগকে আরও অবাক করিয়া তিনি তাঁহার নিজ পরিচয়ে বলিলেন যে তিনি মুসলমান, নাম মহম্মদ। স্থানীয় জুবিলী স্কুলে (যেখানে মুসলমান ছাত্রগণই পড়ে) শিক্ষকতা করেন। আমাদিগকে অধিকতর আশ্চর্য করিয়া তিনি ইহার কিছুদিন পরে একদিন আসিয়া বলিলেন, "দেখুন স্বামীজীর উৎসব তো সমাগত। উহাতে তো জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কয়েক সহস্র দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা হয়। আমার বিশেষ ইচ্ছা যে আমার কতিপয় ছাত্র লইয়া আসিয়া আপনাদের ঐ সেবাকার্যে কিছু সহায়তা করি।"

তাঁহাকে উৎসবের একটি কার্যের ভার দেওয়া হইল। পরদিন ছেলেদের সঙ্গে আসিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্পটির ভার লইয়া তিনি শ্রদ্ধার সহিত অতি সুশৃংখল ভাবে কার্যপরিচালনা করিলেন। কাজ শেষ হইলে সকলের সহিত সানন্দে প্রসাদাদি লইয়া ছেলেদের সঙ্গে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহাই হইল স্বামী প্রেমানন্দের স্বর্গীয় প্রেমের উদাহরণ, যাহার কণা-মাত্র পাইলে আমাদের জীবন ধন্য হইয়া যাইবে, যেখানে জাতি ধর্ম বা কোনও দেশকালের ব্যবধান নাই। তাহার একটু যিনি পাইয়াছেন তাঁহারই জীবন ধন্য হইয়াছে। ন তেষু জাতিকুলভেদঃ (নারদভক্তিসূত্র)।

স্বামী তুরীয়ানন্দ

সে অনেক দিনের কথা—বোধহয় ১৯১৯ বা ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইবে; অনেকটা শরীর সারিতেই ৺কাশী গিয়াছি। তীর্থ দর্শনাদি বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য উহার সহিত ছিল না। বাঙালীটোলায় থাকিতাম, ও রোজই সকালে ও বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতাম।

একদিন এরূপ বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার একরূপ সহপাঠী দুইটি বন্ধুর সহিত দেখা হইল। পরস্পর কুশলাদি প্রশ্নের পর একটি বন্ধু হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখানে রামকৃষ্ণ মিশনে যাও নি ?" 'না' বলায় "উহা বেশ জায়গা, একদিন অবশ্যই যেয়ো, আমরাও সেখানে প্রায়ই যাই" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। অপর বন্ধুটি বলিলেন, "হাঁ হে, সেখানে একজন America-returned (আমেরিকা ফেরত) সাধু আছেন, সেখানে গেলে তাঁর সহিত আলাপ করতে পারবে।" শেষোক্ত বন্ধুটির কথায় একটু হাসিলাম, উহা যে আমার পক্ষে একটি বড় প্রলোভন নহে, তাহাও তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইলাম। কিন্তু বন্ধুগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহাদের নির্বন্ধাতিশয়ে অবশেষে সেই America-returned সাধুটির নিকটে যাইতে হইল। ইনিই স্বামী তুরীয়ানন্দ বা শ্রদ্ধেয় হরিমহারাজ।

যেদিন তাঁহার নিকটে প্রথম যাই, বেশ মনে পড়ে, সেদিন সেখানে উভয় আশ্রমের (রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম) অনেক সাধুকেই দেখিয়াছিলাম, সন্দিগ্ধ মনে তাঁহাদের অনেকের প্রতিই সেদিন ভক্তি হয় নাই ও সঙ্গের বন্ধুটি একে একে সকলের পায়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেও উঁহাদের দু-একজনকেই আমি সেদিন প্রণাম করিয়াছিলাম।

1988

কিন্তু সেবাশ্রমের এক কোণে অবস্থিত 'অম্বিকাধামে' যখন এই মহাপুরুষকে প্রথম দর্শন করিলাম, তখন তাঁহার সৌম্য মূর্তি ও মধুর বাক্যালাপ শুনিয়া মাথাটি আপনিই সেখানে নত হইয়া পড়িল। তারপর বন্ধুটির বিশেষ আগ্রহে ও উক্ত মহাপুরুষের অপার স্নেহে প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার নিকটে যাইতে হইত। তিনিও আমার সর্ববিধ কথা অতি মনোযোগ সহকারে শুনিতেন ও আমার বালকোচিত চাপল্যের কথা শুনিয়া কখনও খুব হাসিতেন, কখনও বা তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া আমার ভুলগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপেই মনে পড়ে, একদিন যখন বৈকালে তাঁহার সহিত বেড়াইতেছি, তখন ৺কাশীতে বহু লোকের সমাগম দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, দেখ, এদের কি ভক্তি! আজ পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হবে, তাই কত ক্লেশ সহ্য ক'রে কত দূর দেশ হ'তে এসে এরা এখানে সমবেত হয়েছে। গ্রহণের সময় গঙ্গা-স্নান ক'রে পবিত্র হ'য়ে এরা ভগবানের নাম ক'রে ধন্য হবে।"

আমরা তখন কিছু কিছু ইংরেজী বই পড়িয়াছি। ভূগোলে চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ে যাহা লেখে, তাহাও শিখিয়াছি। সুতরাং মহারাজের ঐ কথায় হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "মহারাজ, এ তো কুসংস্কার! রাহু তো চন্দ্রকে গ্রাস করে না। পৃথিবীর ছায়াই চন্দ্রের উপর পড়ে ব'লে আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাই। এই কুসংস্কারে আবদ্ধ হ'য়ে লোকে স্নান করবে ও তাদের পুণ্য হ'বে এটা কি ক'রে বিশ্বাস করব?" মহারাজও হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "দেখছি, তুমি সবই জেনে ফেলেছ।" তার পরদিন তাঁহার নিকটে গেলে তিনি সস্নেহে বলিলেন, "দেখ, গ্রহণ বিষয়ে কাল তুমি যা বলছিলে তার একটি অর্থ আছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা নির্লোভ ছিলেন। কোন স্বার্থের বশবর্তী হ'য়ে তাঁরা আমাদের শাস্ত্রের ভিতরে ঐ সব পুণ্যার্জনের কথা ঢুকিয়ে দেন নি। তাঁদের ইচ্ছা ছিল, সকলেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু

সকলে তো তা একরূপে পারে না—এদেরও অধিকারী-ভেদ আছে। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্র তিন প্রকারের বিধি নির্দেশ ক'রেছেন। যাঁরা উত্তম অধিকারী, তাঁদের বলেছেন, প্রতিদিন কষ্ট স্বীকার ক'রেও ভগবানের নাম কর, তাতে শান্তি পাবে—এটিই 'নিয়ম-বিধি'। উত্তম অধিকারিগণ ঐ নির্দেশ পেয়েই প্রতিদিন ভগবানের নাম করছেন। যাঁরা তা পারছেন না, তাঁদের জন্য 'মোদ-বিধি' অর্থাৎ আনন্দদায়ক কিছু দিয়ে ভগবানের দিকে মন নিয়োজিত করতে তাঁদের প্রবৃত্ত করছেন। আর এতেও যারা ভগবানের নাম করবে না, তাদের জন্য 'দণ্ড-বিধি' বা নরকাদির ভয় দেখাচ্ছেন। গ্রহণ-স্নানে পুণ্যসঞ্চয় বা অক্ষয় স্বর্গলাভ ঐ 'মোদ-বিধি'র অন্তর্গত। তবুও ওর লোভে এইসকল লোক কিছুটা ভগবানের নাম করবে—এটাই শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নয়।"

আর একদিন মনে পড়ে গঙ্গাস্নানের কথায় একটু হাসিয়া মহারাজকে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, গঙ্গাস্নান করলে বিশেষ পুণ্য কেন হবে? গঙ্গা তো নদী মাত্র। আর এ কাশীর গঙ্গাকে তো নদীও বলা যায় না"—শীতকাল, তখন গঙ্গায় কোন স্রোত ছিল না। মহারাজ ইহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন ও বলিলেন, "দু' এক পাতা ইংরেজী পড়ে তোমরা গঙ্গাকে এইরূপ অবজ্ঞা করতে শিখেছ। কিন্তু যাঁদের বই পড়ে তোমরা এইরূপ শ্রদ্ধাহীন হ'য়েছ, জানো, স্বামীজী তাঁদের মাথায় কিরূপ আঘাত ক'রে এসেছেন? তিনিও এই গঙ্গার স্তব করতে করতে কিরূপ তন্ময় হ'য়ে যেতেন! আর শুধু তিনি কেন, আচার্য শঙ্কর থেকে কে না এই গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রেছেন! শ্রদ্ধাবান্ হও।"

পূজনীয় মহারাজের পুণ্য সঙ্গ কালে একদিন তিনি বলিলেন, "তুমি কি গীতা পড়েছ? কাল থেকে আমরা এঁর [তাঁহার নিকট উপবিষ্ট নড়াইল কলেজের অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত] সহিত গীতা পড়ব। তুমিও

ইচ্ছা করলে এতে যোগ দিতে পারো।” সানন্দে আমি ইহাতে সম্মতি দিলাম ও তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পরদিন হইতে তিনি গীতা পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। গীতা পূর্বে কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এই জ্ঞান-তপস্বীর মুখে উহা নূতন আকার ধারণ করিল। সাধারণতঃ তিনি কোন ভাষ্য বা টীকার উল্লেখ করিতেন না, সরল সহজভাবে তিনি উহা ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন হইত, তিনি মুখে মুখে শঙ্কর বা শ্রীধরের মতামত উল্লেখ করিতেন। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে আমাদের পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল। উহা হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পড়াইয়া পরে প্রথম হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। যাহাতে আমরা আমাদের চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারি, ইহাই বোধহয় তাঁহার প্রথমে আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে পড়াইবার কারণ।

অপরিণত মনে তখন যে কি পড়িয়াছিলাম প্রায় কিছুই মনে নাই, তবে মনে হইতেছে মনঃসংযমের কথা উঠায় তিনি বলিয়াছিলেন উহা খুবই কষ্টকর, তাই শ্রীভগবান ধীরে ধীরে মনকে বিচারাদির দ্বারা সংযত করিয়া আত্ম-সংস্থ করিতে বলিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমেরিকা হ'তে একটি ভক্ত আমাকে এই বিষয়ে লিখেছিল। আমি তদুত্তরে লিখেছিলাম যে যখনই ধ্যানে বসবে, মনে করবে তোমার বুকের সামনে একটি ‘No Admission’ (প্রবেশ নিষেধ)-এর নোটিশ ঝুলছে। ইষ্টচিন্তা ব্যতীত কিছুই উহাতে প্রবেশ করতে পারবে না, তা হ'লেই দেখবে অন্য সব চিন্তা ধীরে ধীরে সেখান হ'তে চলে যাচ্ছে।” ভক্তটি লিখিয়াছে, সত্যই উহাতে সে অনেক উপকার পাইয়াছে। এই অধ্যায়েই প্রথমে যখন ‘উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং পড়িতেছিলাম, তখন অতি গম্ভীর স্বরে উদাত্ত স্বরে তিনি উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন। তাহার পর অনেক দিন পর্যন্ত যখনই তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিয়াছি, তখনই

ঐরূপ স্বরেই উহা আবৃত্তি করিয়া বলিতেন, "হাঁ, এইরূপেই নিজেকে উদ্ধার করতে হবে, তুমি ছাড়া তোমার উদ্ধারকর্তা আর কেউ নেই।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একদিন বাহির হইতে তাঁহার নিকটে কিছু সদুপদেশ লইতে আসিয়াছিলাম, দেখিলাম তিনি অদ্বৈতাশ্রমের গেট দিয়া বাহিরে যাইতেছেন, প্রণাম করিতেই বলিলেন, "কি প্রয়োজন?" মনের আকুতি জানাইলে বলিলেন, "আগে চোখ খোল, পরে চশমা দেওয়া যাবে, পূর্বে চশমা দিয়ে তো কোন লাভ নেই।" এই পুরুষকারের উপরেই তিনি পুনঃ পুনঃ জোর দিতেন।

আর একবার যখন তাঁহার আদেশে কলিকাতায় যাইয়া আমার পাঠ সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন আবার যাহাতে কোন বন্ধনে না পড়ি, সেজন্য তাঁহার নিকটে আশীর্বাদ চাহিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "বন্ধন মনে করিলেই তো বন্ধন, নতুবা কে তোমায় বাঁধে? তুমি তো সদাই মুক্ত।"

এইরূপে নানাভাবে তিনি আমাদের গীতা পড়িতে উৎসাহ দিলেও সব সময়ে উহা যে গম্ভীরাত্মক হইত—তাহা নহে। খুব সম্ভব পঞ্চদশ অধ্যায় পড়াইবার সময় নির্মম হইয়া সংসার-বৃক্ষ ছেদনের কথা উঠিতেই তিনি কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখাইয়া বলিলেন, "না না স্থ……এখানটি তুমি প'ড়ো না।" আমি অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন মহারাজ!" তদুত্তরে তিনি সেইরূপ গাম্ভীর্য দেখাইয়া বলিলেন, "এ যে বৈরাগ্যের কথা, এসব কি পড়তে আছে?" আমি হাসিয়া ফেলিলাম, তিনিও তাঁহার স্বভাবোচিত উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। তখন জানিতাম না যে, এইরূপে তিনি আমাদের ভিতরে বৈরাগ্যের বহ্নি জ্বালাইয়া দিতেছেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকটে যে সকল যুবক আসিত, তাহারা যাহাতে শ্রদ্ধাশীল ও বীর্যবান হইয়া গড়িয়া উঠে, সে বিষয়ে তিনি সর্বপ্রকারে

তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। স্বামীজীর ছবি তাহাদের মানসপটের উপর অঙ্কিত করিয়া তিনি বলিতেন, "এই দেখ না স্বামীজীই ছিলেন ছেলে; আর তোমরা? তোমরা তো ছেলে নও, অন্য কিছু। স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন: ও মদ্দা পায়রা, ঠোঁট ধরলেই ঠোঁট ছিনিয়ে নেয়, ও তেজীয়ান্ বলদ, লেজে হাত দেবার জো নেই, হাত দিলেই তিড়িং ক'রে লাফিয়ে ওঠে, আর তোমরা একটুতেই ঝিমিয়ে পড়। স্বামীজীর মতো ছেলেই আমাদের চাই।"

এই তেজবীর্যের সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গ কোনও যুবকের ভিতরে দেখিলে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন, আর বার বার সে কথা অপরের নিকটে গল্প করিতেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি যুবক দুই বৎসর রাজরোষে অন্তরীণ (interned) থাকিবার পর মুক্ত হইয়া ৺কাশীদর্শনে আসিয়াছিল। কাশীর অন্যান্য স্থান দর্শন করিবার পর সে রামকৃষ্ণ মিশন দর্শন করিতে আসে ও পূজনীয় হরি মহারাজের নিকটে আসিয়া স্বামীজীর আদর্শ সম্বন্ধে বলিতে থাকে। কথাপ্রসঙ্গে সে বলে, "আমি স্বামীজীর ভক্ত, ঐরূপ সর্বত্যাগী তেজস্বী সন্ন্যাসীই আমরা দেখতে চাই।" কিন্তু পরে অন্য কথা বলিতে বলিতে সে বলিল, "কিন্তু যাহারা সংসারের ঝঞ্ঝাট পরিত্যাগ ক'রে চলে আসে, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আমি, তোদের বলি coward (কাপুরুষ)।"

যুবকের এই প্রগলভ বাক্যে মহারাজ কিছুমাত্র বিচলিত বা দুঃখিত না হইয়া হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "ঠিকই তো। তবে কিন্তু তোমার স্বামীজীও ঐরূপে সংসার ত্যাগ করেই এসেছিলেন। সে বিষয়ে কি বলো?"—ছেলেটি ইহা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইল ও ধীরে ধীরে আরও দু একটি কথার পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

ছেলেটি চলিয়া গেলে মহারাজ বলিলেন, "এইরূপ ছেলেই তো চাই।

দেখ না, কেমন আমাদের মুখের ওপর আমাদের coward (কাপুরুষ) বলে গেল, স্বামীজী এইরূপ ছেলেই পছন্দ করতেন।"

তরুণ ব্রহ্মচারীদের কোন ত্রুটি দেখিলে তিনি তীব্র ভৎর্সনা করিয়া উহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন, আবার তাঁহাদের সামান্য মাত্র গুণ দেখিলে বলিতেন: "তোমরা তো সোনার চাঁদ ছেলে হে, আজ স্বামীজী থাকলে তোমাদের মাথায় ক'রে নাচতেন।"

চিরদিনের বেদান্ত-তপস্বী হরি মহারাজ, শেষ দিন পর্যন্ত বেদান্তের চর্চা ও তদনুযায়ী কঠোর জীবন যাপন করিয়াই তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত করেন; কিন্তু তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে দেখিয়াছি স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্মযোগের উপরে তাঁহার কি অবিচলিত শ্রদ্ধা! মিশনের সেবাশ্রমের সাধু কর্মিগণকে দেখাইয়া বলিতেন: "এরাই ঠিক ঠিক কাজ করছে। অপরে তো শুধু গুলতান ক'রেই সময়ক্ষেপ করছে।"

কিন্তু ইহাদের কার্যগুলিও যাহাতে শ্রদ্ধা ও ভাবসমন্বিত হয়, কর্মযোগীর আদর্শানুযায়ী হয়, সেদিকেও তিনি তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন। ঐ সকল কার্যে তাহাদের ভিতরে অহংকারের কিছুমাত্র ফুট দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন: "তোমরা কি ভেবেছ, তোমাদের এই সকল কার্যের দ্বারা তোমরা অসামান্য কিছু ক'রে ফেলছ? তোমরা যা করছ তা তো আমি ১৫৲ মাহিনায় মেথর দিয়ে করাতে পারি। আর অফিসে যারা কাজ করছ তার জন্য হয় তো বা মাসিক ২০।২৫ টাকার মতন খরচ করলে তোমাদের অপেক্ষা ভাল লোক পাওয়া যেতে পারে। এর জন্য অহংকারের কি আছে?"

কিন্তু ইহা যে তাঁহার অন্তরের কথা নয় ও উহা শুধু কর্মীদের অহংভাব দূর করিয়া শুদ্ধভাবে কাজ করাইবার জন্যই বলিয়াছিলেন, তাহা পরদিন তাঁহার কথাতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম।

মহারাজের ঐ কথা শুনিয়া কাশীর জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত মঠের

জনৈক সাধুকে বলিতেছিলেন : "মহারাজ তো ঠিকই বলেছেন, আপনাদের মতো কৃতী ছেলে সংসারে থাকলে কত কাজ করতে পারতেন, কিন্তু না ক'রে কি সামান্য কাজে আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন!" পূজনীয় মহারাজের নিকটে উহা বলিলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন ও বলেন : "ও কি ক'রে আমার কথার অর্থ বুঝবে? ও পণ্ডিত হ'লেও সংসারী, শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ বলেছেন, 'মুলো খেলে মুলোর ঢেকুরই ওঠে,' ওরও তাই হয়েছে। চিরদিন সংসার ক'রে আজ নিষ্কাম কর্মের অর্থ ও কি ক'রে বুঝবে? আমি তো ঐভাবে বলিনি। বলেছি—অহংকারশূন্য হ'য়ে নিষ্কামভাবে তোমরা সেবা কর, তাতেই তোমরা তোমাদের চরমলক্ষ্যে পৌঁছুবে।"

জপধ্যান সম্বন্ধেও কাহারও ঐরূপ অহংকারের আভাস দেখিলে তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন : "তুমি ঠাকুরঘরে বসে কি ক'রে এলে? মালা জপ করলে না কলা চটকিয়ে এলে?" অর্থাৎ ঠিক ঠিক জপধ্যান করিলে এরূপ অহংকার আসে না।

আমাদের সহিত যখন তাঁহার দেখা হয়, তখন তাঁহার তপস্যায় কালাতিপাত করিবার ভাব চলিয়া গিয়াছে, বেদান্তের ভাবানুযায়ী তখন তিনি তাঁহার জীবনকে দৃঢ় করিয়াছেন ও শুদ্ধ আত্মা যে দেহ মন বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁহার প্রতি কথায় ও আচরণে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। শরীর অশক্ত, অতিকষ্টে হাঁটিতে পারেন, তবুও সর্বদা শাস্ত্র-চর্চা ও অপরের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত। কিসে আমাদের ভিতরে একটু চৈতন্যের উদ্রেক হইবে, ইহা লইয়াই সর্বদা চিন্তা, দেহবুদ্ধিযুক্ত আমরা চিরদিন দেহকে সত্য বলিয়া মনে করিতাম ও ইহার সুখে ও দুঃখে যে আমাদেরই সুখ দুঃখ হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিত না। কিন্তু তাঁহার ঐ কঠিন রোগশয্যাতেও দেখিয়াছি, কিরূপে মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতেছেন, "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে

থেকো।” আমাদের নিকটে তাঁহার এ গান শুধু কথার কথা বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু যেদিন দেখিলাম, তাঁহার হাতের পাতায় একটি দুষ্ট ব্রণ হইয়াছে ও কলিকাতা হইতে বিখ্যাত সার্জেন ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য আসিয়া উহা অপারেশন করিয়া নিত্য সেই ক্ষত স্থান প্রোব (Probe) দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন, আর তিনি উহা ছোট ছেলের মতো আনন্দ করিয়া দেখিতেছেন, তখন উহা উক্ত ডাক্তারের ও আমাদের সত্যই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। কি করিয়া মানুষ এরূপ দেহবুদ্ধি-শূন্য হইতে পারে তাহা বুঝি নাই।

আর একদিনের কথা। পূজনীয় মহারাজের উপদেশাদি শুনিয়া মনে একটু বৈরাগ্য আসিয়াছে, ‘সংসার অসার’ একথাও মুখে মুখে বলিতেছি ও আরও কিছু চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একটি ছেলের কথা উঠায় মহারাজকে বলিয়াছিলাম, মহারাজ, উহার সংসারের প্রতি খুবই টান। তখন ‘সংসার’ বলিতে আত্মীয়-স্বজন ঘর-বাড়িকেই বুঝিতাম। কিন্তু ইহা ছাড়া যে সংসার অর্থে আর কিছু হইতে পারে, তাহা মনে আসে নাই। মহারাজ আমাদের প্রগল্‌ভ কথা শুনিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, “ঠিক, কিন্তু জেনো, শরীরটাও সংসার।” ইহা শুনিয়া তখন মাথায় সত্যই বাজ পড়িয়াছিল। যে শরীরটার কথা নিত্য চিন্তা করিতেছিলাম, যাহার সুস্থতা অসুস্থতার কথা মহারাজ নিত্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ও তাঁহারও ঐরূপ হয় এবং উহার প্রতিকার কি ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় নিত্যই আলাপ করিতেছি,—সে যে আমার বন্ধনের কোনরূপ কারণ হইতে পারে পূর্বে কখনও ভাবি নাই। আমার অবস্থা দেখিয়া মহারাজ পুনরায় বলিলেন, “কি বলো সু—, ঠিক তো ?” তখন মাথা নীচু করিয়া বলিয়াছিলাম, “হ্যাঁ মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন এটি জীবনে উপলব্ধি করতে পারি।”

বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত তিনি সর্বদা বেদান্তের উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব অতি সহজভাবে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেন। বলিতেন, “আমরা

তো পূর্ণ ব্রহ্মই আছি, তবু দেখ না মায়ার প্রভাবে আমরা নিজেদের কি ক্ষুদ্র মনে করছি!" এই উপলক্ষে তিনি গল্প করিতেনঃ "দেখ, পরিব্রাজক অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একটি জীর্ণ মন্দিরের গায়ে স্বামীজী কালো কয়লা দিয়ে লেখা এই দোঁহাটি দেখতে পেয়েছিলেন—

চাহী চামারী তুহী সব নীচ্ উনকো নীচ্।
ইয়ে তু পূরণ ব্রহ্ম থা যব তু নেহী হোতী বীচ্॥

কে ঐ দোঁহাটি লিখেছেন বা কোথায় তিনি উহা পেয়েছিলেন, কাহারও জানা নাই; কিন্তু কি সুন্দর উহার অর্থটি!—হে আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা, তুই সর্বাপেক্ষা নীচ, তুই চামারনী মেথরানী সদৃশ, এ (নিজ আত্মা) তো পূর্ণ ব্রহ্মই ছিল, তুই এর নিকটে এসে একে কি ছোটই না ক'রেছিস!"

কখনও কখনও মাথা দোলাইয়া মহারাজ গাহিতেনঃ

"গুটিপোকায় গুটি করে
কাটলেও সে তো কাটতে পারে
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি
কভু সে তো কাটতে নারে।"

বলিতেন, "এইরূপই মায়া; শ্রীশ্রীঠাকুর এই মায়ার কথা বুঝুতে গিয়ে নিজের মুখ একটি গামছা ঢাকা দিয়ে বলতেন, 'এই দেখ, আমি তো এত নিকটে অথচ সামান্য এই গামছার আড়ালের জন্য তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না'।"

এই সকল কথা বলিয়া মহারাজ কখনও কখনও গাহিতেনঃ

"এমনি মহামায়ার মায়া
রেখেছে কি কুহক ক'রে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য
জীবে কি তা জানতে পারে।"

আবার কখনও বলিতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর কতগুলি ছোট ছোট ঘট দেখিয়ে বলতেন, 'এই ঘটগুলি একই জল দ্বারা পূর্ণ কর তো, আর ওদের প্রত্যেকের উপরে ১।২ ক'রে বিভিন্ন নম্বর দাও, দেখবে কিছু পরে মনে হ'বে ওদের প্রত্যেকটির ঘটের জল আলাদা, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, ঘটগুলি ভেঙ্গে ফেললে সব ঘটেই সেই একই জল দেখতে পাবে'—ঐ ঘটগুলিই উপাধি, ঐগুলি দূর না করলে আমাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হয় না।"

কখন বলিতেন, "সাধন-ভজন দ্বারা উহা উপলব্ধি হয়।" আবার কখন বলিতেন, "তবে সাধন-ভজন কি জানো? উহা শুধু ডানা ব্যথা করা। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন সুন্দর উপমা দিয়ে বলতেন, 'মাস্তুলের পাখি' জাহাজ কালাপানিতে গেলে যেমন তার বাসার খোঁজে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিকে উড়ে গিয়ে বাসার সন্ধান না পেয়ে শেষে মাস্তুলেই আশ্রয় নেয়, তেমনি সাধন-ভজন করলেও শেষে দেখা যায় যে তাঁর কৃপা ব্যতীত আমাদের শেষ আশ্রয় আর কিছুই নেই। কিন্তু উপযুক্ত সাধন-ভজন ব্যতীত উহা বুঝবার উপায়ও নেই।" কিন্তু চিরদিনের এই জ্ঞান-তপস্বীর ভিতরেও মাঝে মাঝে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। সাধু শান্তিনাথ নামক একজন কঠোর তপস্বী তখন পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট প্রায়ই আসিতেন; তখন তিনি মৌনী। কাশীর শীতেও গায়ে একটি মাত্র কম্বল ও পরিধানে কৌপীন ব্যতীত অন্য কোনরূপ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার চির-দিনের কঠোর তপস্যার কথা একদিন পূজনীয় অচলানন্দজী [কেদারবাবা] পূজনীয় হরি মহারাজের নিকট আমাদের সামনেই বর্ণনা করিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, একসময়ে শান্তিনাথ ও আমি হৃষীকেশে [?] পাশাপাশি কুঠিয়ায় থাকতাম। দেখেছি, ওর বুকের উপর দিয়ে গোখরো সাপ চলে গেছে তবুও ওর ধ্যান ভাঙ্গেনি। এইরূপ কত কঠোর তপস্যাই না ও করেছে, ইত্যাদি।" কিন্তু পূজনীয়

No. 1988
LIBRARY
RAMAKRISHNA MATH
BELUR MATH (HOWRAH)

হরি মহারাজ এইরূপ কঠোর তপস্যার যথার্থ মর্ম বুঝিতেন, তাই একদিন যখন মৌনী শান্তিনাথ আসিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেছিলেন তখন অতি স্নেহে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "শান্তিনাথ, অনেক তো করলে। এখন শ্রীশ্রীমায়ের শরণাপন্ন হও। তাঁর কৃপা ব্যতীত কিছুই হবার নয়।" জানি না, শান্তিনাথ তাঁহার ভাব লইয়াছিলেন কিনা।

এই সময় পূজনীয় হরি মহারাজ প্রায়ই গাহিতেন:

"আর কারে ডাকব শ্যামা,
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি তেমন ছেলে নই মা তোমার
ডাকব গো 'মা' যাকে তাকে॥
মা যদি সন্তানে মারে,
(তবু) শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে
ছাড়ে না মা যতই বকে॥"

৺কাশীধামে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে শরীর যাইবার সময়, শুনিয়াছি যে, তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি হাতজোড় করিয়া বলিতে বলিতে সর্বশেষে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত' ইত্যাদি বলিয়া শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহার এই শেষ কথাটি লইয়া ৺কাশীর উভয় আশ্রমের পণ্ডিত সাধুগণের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়; পূজনীয় জগদানন্দ মহারাজ একদিন আমাদিগকে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পড়াইতে পড়াইতে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি ঐ আলোচনায় যোগ দিয়েছিলাম, ও বলেছিলাম যে যিনি চিরদিন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলেছেন তিনি কি ক'রে শেষ সময়ে ঐরূপ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য' বলতে পারেন? ওকথা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা, বোধহয়,

তাঁর কথাটি ঠিক ঠিক ধরতে পারেন নি। কিন্তু এখন যখন ছান্দোগ্য উপনিষদে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' পড়ছি ও তার যথার্থ মর্ম বুঝবার চেষ্টা করছি, তখন দেখছি পূজনীয় হরিমহারাজের সেই শেষ কথাটিই এখানে বিবৃত হচ্ছে। সত্যই এটি বিজ্ঞানীর অবস্থা। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন, 'জ্ঞানী নেতি নেতি ক'রে'—অর্থাৎ তিনি মন নন, তিনি বুদ্ধি নন, তিনি অহঙ্কার নন—ইত্যাদি ক'রে যখন সেখানে পৌঁছোয় তখন দেখে তিনি শুধু নির্বিশেষ ব্রহ্ম নন, তিনিই এই জীবজগৎ, এই পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি সবই হয়েছেন। এটাই বিজ্ঞানীর অবস্থা, জ্ঞানীর নয়। ছাদে উঠবার সময় যেমন লোকে মনে করে মেঝে, সিঁড়ি কিছুই তো ছাদ নয়—সে ছাদ নয়, ছাদ নয় ব'লে ত্যাগ ক'রে ছাদে ওঠে—ছাদে উঠে দেখে ছাদও যা দিয়ে তৈরী সিঁড়ি প্রভৃতিও তাই দিয়ে তৈরী হয়েছে। তখন সে সর্বস্থানে তাঁকেই দেখতে পায়।"

এইরূপ পূর্ণ জ্ঞানীর বা সম্যক্ বিজ্ঞানীর দর্শন পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচরগণের মধ্যে প্রথমেই শ্রীশ্রীমহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দের] কথা মনে পড়ে। তাঁহাকে প্রথম কবে দর্শন করিয়াছিলাম তাহা ঠিক মনে নাই। তবে বেশ মনে পড়ে যে একদিন বরাহনগর হইতে আমার সমবয়সী একটি বন্ধুসহ গঙ্গাপার হইয়া বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। বোধ করি, ইহা ১৯১৬ কি ১৯১৭ সালের ঘটনা।

সাধুদর্শন করিতে গেলে কিছু ফল সঙ্গে লইয়া যাইতে হয় বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তাই দুইটি ডাব [চার পয়সায়] ক্রয় করিয়া মঠে উপস্থিত হইলাম। খেয়াপার হইয়া গঙ্গাঘাটে উঠিবার সময় দেখিলাম গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি বেঞ্চের উপর একটি সাধু উপবিষ্ট এবং তাঁহার সন্নিকটে কয়েকজন অল্পবয়স্ক সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া কেন যেন মনে হইল যে তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দজী হইবেন। আমরা দুইবন্ধু তাঁহার পদতলে ডাব দুইটি রাখিয়া প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিবামাত্র তিনি উপস্থিত জনৈক সাধুকে বলিলেন,—"এই দুটি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়ে আয়—"। আমরা একটু আশ্চর্য হইলাম। কেননা, ইহার পূর্বে যখনই কোন সাধুর জন্য ফল-মিষ্টান্নাদি নিয়া গিয়াছি তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন যে উহা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য আনিয়াছি কি না। কোন সাধু বা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য আনীত হইলে সেই দ্রব্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করা হইত না। এস্থলে এই ব্যতিক্রম দেখিয়া স্বাভাবিকরূপেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরে জানিয়াছি যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মানসপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন সত্ত্বা ছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের আর একটি আচরণে আমি আরও বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি আমার সঙ্গী যুবক বন্ধুটিকে তাহার নাম, ধাম ও

অন্যান্য পরিচয় সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেও আমার দিকে একবারও তাকাইলেন না। হঠাৎ আমার দিকে তাঁহার সেই দিব্যচক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, "তোকে তো চিনি!" ইহা বলিয়াই আমার সেই বন্ধুটির সহিত আবার অন্য কথা বলিতে লাগিলেন। আমিও অবাক! কেননা, ঐদিনই ত আমি তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম। মঠে যোগ দিবার পর জানিয়াছিলাম যে ভবিষ্যতে কৃপাদানে ধন্য করিবেন এরূপ কিছু কিছু সৌভাগ্যবানকে তিনি অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

ইহার পর আর ২।৩ বৎসর তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। ১৯১৯-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য ৺কাশী আসি। সেই সময়ে হঠাৎ আমার পূর্ব-পরিচিত ও সহপাঠী (ভবিষ্যতে স্বামী অখিলানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দের) সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখা হয়। ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণার অতি নিকটে অবস্থান করিলেও এখন পর্যন্ত উঁহাদিগকে দর্শন করিতে যাই নাই। কিন্তু তাহারা, বিশেষতঃ নীরদ নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত একদিন সে আমাকে শ্রদ্ধেয় হরি মহারাজ বা স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট আনিয়া হাজির করিল। তাঁহার গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা ও সহানুভূতি-সূচক কথা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমার একান্ত অলক্ষ্যে আমার ভিতরে ধর্মের সেই প্রসুপ্ত ভাব জাগিতে লাগিল। পূর্বে এইটুকু মাত্র জানিতাম—রাজনীতির সহিত কিছু ধর্ম থাকা প্রয়োজন যাহাতে মনের ও চরিত্রের দৃঢ়তা আসে।

ধর্ম বিষয়ে আমি তখন অতিশয় অজ্ঞ ও সংশয়বাদী। পাশ্চাত্য দর্শন পড়িয়া মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভগবান কখনই দর্শনগম্য নহেন, তিনি যুক্তি-তর্কেরই বিষয়। তবে তাঁহাকে চিন্তা করিলে মনে কিছু নৈতিক শক্তি আসিতে পারে,—এই মাত্র।

মনের এইরূপ সংশয়াকুল অবস্থায় পূজ্যপাদ হরি মহারাজের দর্শন

পাইলাম। তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে মনের সংশয় ধীরে ধীরে দূর হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল ভগবান শুধু যুক্তি-তর্কের বিষয় নন। উপযুক্ত সাধন-ভজনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করাও সম্ভব। তাঁহাকে অনেকে দর্শন করিয়াছেন। সাধন-ভজন ও সদ্‌গুরুর কৃপা হইলে আমরাও তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব। পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে একদিন উহা নিবেদন করিলাম, এবং দীক্ষা দিয়া তিনি যাহাতে আমাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন তজ্জন্য মনের আকূতি জানাইলাম। কিন্তু তিনি গম্ভীর হইয়া স্মিতহাস্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া শুধু বলিলেন, "আমরা তো কাউকে দীক্ষা দিই না।" অত্যন্ত বিষণ্ণ ও হতচিত্ত হইয়া সেখানেই বসিয়া রহিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি পরক্ষণেই কৃপাপূর্বক বলিলেন, "তোমাকে আমরা এমন একজনের নিকট পাঠাবো যিনি আধ্যাত্মিকতায় আমাদের সকলের চেয়ে অনেক উচ্চ।"

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। পাঠ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা [তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি] মন হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তবুও পূজ্যপাদ হরি মহারাজের আদেশে পাঠ সমাপ্ত করিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহারই নির্দেশে একদিন সকালে বাগবাজারের বলরাম-মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিলাম। দেখিলাম, দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির পাশে একটি ছোট ঘরে একটি ক্ষুদ্র তক্ত-পোশের উপরে শ্রীশ্রীমহারাজ বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে অল্প কয়েকজন ভক্ত। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া আমিও তাঁহাদের পাশে বসিলাম। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। আশ্চর্য হইয়া শুনিলাম যে এখানেও সেই বিশ্বযুদ্ধের কথাই আলোচিত হইতেছে। উপস্থিত ভক্তদের একজন জার্মানপক্ষ অপর একজন ইংরাজপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন ও উভয়েই নিজ নিজ পক্ষ জয়ী হইবে—উত্তেজিত হইয়া

এরূপ তর্ক করিতেছেন। শ্রীশ্রীমহারাজ যেন উহা খুবই উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার সেই ছোট্ট গড়গড়ায় ধূমপান করিতে করিতে একবার এদিকের পক্ষ ও পরক্ষণেই অপর পক্ষ গ্রহণ করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত উহাতে যোগ দিতেছেন। আমি তো দেখিয়া অবাক! আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি? ইনি তো আমাদেরই ন্যায় রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত! ইনি আবার কিরূপে পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দজী অপেক্ষা অনেক উন্নত? ইত্যাদি অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরেই দেখি যে সেখানকার আবহাওয়া একেবারে অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজ গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ আর কোন কথা না বলিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের কথা নিবেদন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িয়া রাস্তার দিকের সরু বারাণ্ডায় গম্ভীরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্বের মূর্তি আর নাই। আমি চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, কোন এক অজ্ঞাত ভয় ও বিস্ময় যেন আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ বোধহয় কৃপা করিয়াই তিনি আমার সম্মুখে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আমিও ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, "মহারাজ, পূজনীয় হরি মহারাজ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।"

আর কোন কথাই আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। শ্রীশ্রীমহারাজ সস্নেহে আমার দিকে একটু তাকাইয়া শুধু বলিলেন, "বাবা, ভগবানই একমাত্র সত্য!" জানি না, কিভাবে তিনি একথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মনে প্রচুর শান্তি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠ আর সমাপ্ত হইল না। পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরম কৃপায় কয়েক মাস পরে মঠে যোগদান করিলাম। আমার ন্যায়

আরও কয়েকজন যুবক সেই সময়ে মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পরম স্নেহে আমরা বর্ধিত হইতে লাগিলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ [স্বামী সারদানন্দজী] মাঝে মাঝে উদ্বোধন হইতে মঠে আসিতেন। পূজনীয় অভেদানন্দজী মহারাজও দীর্ঘ ২৫ বৎসর আমেরিকা প্রবাসের পর মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে মঠ তখন ভরপুর। আমাদের আর কিছু চাহিবার আছে বলিয়া তখন মনে হইত না। ইঁহাদের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা আমরা যথাসাধ্য করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একজন সাধু ত্রস্তব্যস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, 'ওহে, শুনেছ, মহারাজ আসছেন। এইবার তোমরা মঠের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্কের দর্শন পাবে।' তাঁহার কথার অর্থ তখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। শ্রীশ্রীমহারাজকে ইতঃপূর্বে দুইবার তো দেখিয়াছি। সুতরাং তাঁহা হইতে আর নূতন কি পাইব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখিলাম নানাদিক হইতে সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া মঠে সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের সকলের মুখেই এক কথা— 'মহারাজ আসছেন, মহারাজ আসছেন!' তাঁহার নিকট হইতে না জানি, তাঁহারা কি মহারত্নের সন্ধান পাইবেন!

যথাসময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ আসিয়া পৌঁছিলেন। সত্য সত্যই দেখিলাম মঠের আবহাওয়া একেবারেই বদলাইয়া গেল। পূর্বে উহা স্বর্গীয় ছিল, এখন উহা বহুগুণ অধিক দিব্যভাবে পূর্ণ হইল। কতক্ষণে মহারাজের দর্শন পাইবেন, কতক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে দু' একটি কথা শুনিতে পাইবেন, ইহার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। শুধু সাধু বা ভক্ত নন, নানাদিক হইতে শিল্পী, সাহিত্যিক ও অন্যবিধ গুণিগণও মঠে সমবেত হইতে লাগিলেন। আমরা, নবাগত ব্রহ্মচারীরা, তখনও ইহার অর্থ সম্যক বুঝিতে পারি নাই।

এই সময়ে দেখিতাম অতি প্রত্যুষে শ্রীশ্রীমহারাজ শয্যাত্যাগের পর তাঁহার নিত্যকর্মাদি সমাপন করিয়া মঠের দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় একটি আরাম কেদারায় আসিয়া বসিতেন। আমরা, নবাগত ব্রহ্মচারীরা, তৎপূর্বেই সেখানে আসিয়া দুই সারিতে বসিয়া জপধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম। তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না। তবুও তাঁহার উপস্থিতিতেই আমাদের জপধ্যান জমিয়া যাইত।

অধিকাংশ সময় তিনি আনমনা দৃষ্টি লইয়া স্থিরভাবে চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন। কখনও কখনও বা আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে আমাদের দুই সারির মধ্যে পাদচারণা করিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ যখন আরাম কেদারায় বসিতেন তখন দেখিতাম তিনি সর্বদাই ভাবস্থ। তাঁহার চক্ষু দুটি ফ্যাল্‌ফ্যালে;—শ্রীশ্রীঠাকুরের ডিমে-তা-দেওয়া পাখির অবস্থার মত। কোনদিকে লক্ষ্য নাই। কি যে দেখিতেছেন বা কি যে শুনিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার নিকটেই একটি গড়গড়া থাকিত। সেবক কলিকাতে তামাক সাজিয়া অতি সন্তর্পণে উহা বসাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ গড়গড়ায় দু' একটি টান দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃতে পড়িয়াছি যোগীর চক্ষু নাকি ঐরূপ হয়। শ্রীশ্রীমহারাজকে যাঁহারা ঐ অবস্থায় না দেখিয়াছেন তাঁহারা উহা কতদূর ধারণা করিতে পারিবেন জানি না, কিন্তু আমরা সত্যই পূর্বের বহু জন্মের সুকৃতিবলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আবার সেই স্বর্গীয় চক্ষের দৃষ্টি একবার যখন কাহারও উপর পড়িত তখন তাহার হৃদয়ে আনন্দস্রোত বহিয়া যাইত। কেন যে এরূপ অনুভূতি হইত তাহা কেহই বলিতে পারিত না। কিন্তু ঐরূপ ভাগ্যবান দু' একজনের মুখে শুনিয়াছি যে সেই দৃষ্টি একবার পড়িলে অন্ততঃ একদিন তাঁহারা আনন্দ-প্লাবিত হইয়া রহিতেন ও যদি মহারাজ কখনও কাহাকেও স্পর্শ করিতেন তাহা

হইলে অন্ততঃ তিন দিন ধরিয়া সেই দিব্যানন্দের ঢেউ তাহার ভিতর বহিয়া যাইত।

দীর্ঘ সময় এইভাবে কাটিয়া যাইত। সূর্যোদয় হইলে প্রথমে শ্রীশ্রীমহারাজের গুরুভ্রাতাগণ ও পরে মঠের অন্যান্য প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের জপধ্যানাদি সারিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতে আসিতেন। দেখিতাম, পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও অভেদানন্দ মহারাজ ভূমিষ্ঠ হইয়া 'সুপ্রভাত' বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ সাষ্টাঙ্গ হইয়া ও পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার সদ্যোধ্যানোত্থিত, উন্মনা চক্ষু দুটি লইয়া হাতজোড় করিয়া 'সুপ্রভাত, মহারাজ সুপ্রভাত' বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করিতেন। মহারাজ প্রত্যেককেই 'সুপ্রভাত' বলিয়া প্রণামের প্রত্যুত্তর দিতেছেন। শুধু মহাপুরুষ মহারাজের বেলায় 'সুপ্রভাত, তারকদা, সুপ্রভাত' ইত্যাদি বলিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় বলিয়াই বোধহয়, এরূপ করিতেন।

ইহার পর অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও সহিত দু' একটি কথা বলিয়া, কাহারও সহিত বা একটু 'ফষ্টিনষ্টি' করিয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন। কিন্তু দেখিতাম, সকলের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইত।

সকালে কাজের ঘণ্টা পড়িলে আমরা নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাইতাম। শ্রীশ্রীমহারাজও সামান্য কিছু খাইয়া মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহাকে এ সময়ে যে মূর্তিতে দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিবার নয়। দেখিতাম, শ্রীশ্রীমহারাজ ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সেবক তাঁহার মাথায় একটি ছাতা ধরিয়া অতি দ্রুতপদে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। কেন জানি না, তখন মনে হইত, শ্রীশ্রীমহারাজের শরীর যেন দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। চলিবার সময়

তাঁহার পা-দুটি যেন ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। তাঁহার এ মূর্তি যখনই দেখিবার সৌভাগ্য হইত, তখনই একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতাম।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর আমরা আবার শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট মিলিত হইতাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহারাজের গুরুভ্রাতাগণ, সুধীর মহারাজ [স্বামী শুদ্ধানন্দজী], শুকুল মহারাজ [স্বামী আত্মানন্দজী] প্রভৃতি স্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্যগণ ও অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ যাঁহারাই তখন মঠে থাকিতেন, সকলেই আসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট আমাদের সহিত মিলিত হইতেন। কেহবা চেয়ারে বসিতেন, কেহবা আমাদের সহিত মেঝেতে বসিয়া যাইতেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া থাকিবার পর, শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের বলিতেন, "তোদের কার কি প্রশ্ন আছে, কর্, না হয় পেসনকেই [হরিপ্রসন্ন মহারাজ বা বিজ্ঞান মহারাজকেই] কর্।" আমাদের মুখে প্রায়ই কোন প্রশ্ন যোগাইত না, তখন মহারাজ নিজেই আমাদের হইয়া বিজ্ঞান মহারাজকে প্রশ্ন করিতেন। দেখিতাম, ছোট ছেলে মাস্টারের নিকট পড়া দিবার সময় যেমন ভয়ে জড়সড় হয়, বিজ্ঞান মহারাজও সেইরূপ অতি সংকোচের সহিত মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। পরে ঐ প্রশ্নই আবার অন্যান্য মহারাজগণকে করা হইত। তাঁহারাও নিজ নিজ ভাবানুযায়ী উহার যথাযথ উত্তর দিতেন। প্রত্যেকেরই উত্তর অতি সুন্দর বলিয়া মনে হইত এবং আমাদের নিকট একটি নূতন আলোকপাত করিত। কিন্তু সর্বশেষে শ্রীশ্রীমহারাজ যখন উহার উত্তর দিতেন, তখন মনে হইত, ইহাই তো উহার শেষ উত্তর, ইহা না হইলে উহা হয়তো কিছু অপূর্ণ থাকিয়া যাইত।

এইরূপে একদিন শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "তোরা প্রশ্ন কর্ তো, ভগবানকে দর্শন করলে তার অবস্থা কিরূপ হয়।" ঐভাবে প্রশ্নটি সকলের নিকট ঘুরিল। সকলেই অত্যন্ত চমৎকার উত্তর দিলেন, কিন্তু পরিশেষে

যখন মহারাজ বলিলেন, "কেন, উপনিষদের সেই শ্লোকটি বল্ না,—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥' "—[তাঁহাকে দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া যায়, সর্ব সংশয় দূর হয়, সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।] তখন মনে হইল,—ইহাই তো ঠিক উত্তর, ভগবদ্দর্শন হইলে এইরূপই তো হইবার কথা।

[২]

এইরূপ সকালে বিকালে শ্রীশ্রীমহারাজের চরণপ্রান্তে বসিয়া আনন্দে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন একটি বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। স্বামী শুদ্ধানন্দজী তখন মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক, বেলুড় মঠের কিছু কিছু কাজও তিনি দেখিতেন। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত, নিরভিমান ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং আমাদের সকল কাজে আন্তরিক উৎসাহ দিতেন। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমরা সকলে শ্রীশ্রীমহারাজের অমৃতোপম কথা শুনিতেছি, তিনি মঠের কর্ম-পরিচালক ও আর একজন সাধুকে লইয়া হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একটু উত্তেজিতভাবেই বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনার নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে।" শ্রীশ্রীমহারাজ অন্তর্দ্রষ্টা, তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন ও বলিলেন, "বল সুধীর [শুদ্ধানন্দ মহারাজ], তোমার কি বলবার আছে?" তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এই সকল ছেলেরা আপনার নিকট ব'সে আপনার উপদেশ শুনছে। অথচ, মঠের কাজকর্ম করতে হ'লে এরা প্রায় কেউ কিছু করে না। এইভাবে চললে, আমাদের পক্ষে মঠের কাজ চালানো খুবই মুশকিল হ'য়ে দাঁড়াবে। মহারাজ, তাই আপনার কাছে নিবেদন, আপনি দয়া ক'রে আমাদের

অনুমতি দিন যে যারা কাজ করতে চায় না তাদের আমরা যেন মঠ থেকে বের ক'রে দিতে পারি।" শ্রীশ্রীমহারাজ এতক্ষণ তাঁহার কোন কথার উত্তর দেন নাই, কিছু পরে যখন তিনি [শুদ্ধানন্দ মহারাজ] বলিলেন, "মহারাজ, আর একটি নিবেদন, আমরা বের ক'রে দিলে ওরা যেন আপনার এখানেও আশ্রয় না পায়," তখন মহারাজ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি একটু উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি বলছো, সুধীর? তোমাদের কেবল কাজ আর কাজ; এই সব ছেলে যার জন্যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, যার জন্যে সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছে, তার কতদূর কি হ'ল—তোমরা কি কখনও ওদের তা জিজ্ঞাসা কর? কখনও কি খোঁজ নাও, এরা কে কতটুকু ধ্যানজপ করে? আমি তো দেখছি এরা প্রায় কেউই কিছুই করে না। কেউ বা একটু আরাত্রিকে যায়, আবার কেউ বা তাও যায় না। এই জন্যেই তো আমি এদের নিয়ে বসি।...কোথায় তোমাদের পূর্ব সাধন-ভজনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এদের এ বিষয়ে একটু সাহায্য করবে, না, কেবল কাজ আর কাজ!" এমন সময়ে একজন প্রাচীন মহারাজ ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "এরা তো সবই জানে, আমাদের কাছে কি আর শিখবে?" শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "কি বলছো ভাই...? এরা কতটুকু জানে? এই তো সবে ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসেছে! তোমরা যদি এদের কিছু না দাও, এরা কোথা হ'তে শিখবে? দেখ ভাই, কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। এই দেখ না, দলে দলে ছেলেরা হরিভায়ের [তুরীয়ানন্দজীর] সেবার জন্যে কাশী ছুটছে। আর এখানে তোমার আমার একটি সেবক পাচ্ছি না! এরা সেখানে কিছু পায়, তাই যাচ্ছে। আর আমরা এখানে এদের কিছু দিতে পারছি না।" পরে সুধীর মহারাজের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আর সুধীর, তুমি এদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে অনুমতি চাচ্ছো, তা তোমরা করতে পার, কিন্তু আমার দরজা এদের জন্যে সর্বদা

খোলা থাকবে, আমি কাউকে তাড়িয়ে দিতে পারব না। তোমরা কেবল কাজের কথা বল, কিন্তু আমি তো দেখছি, এখন আমাদের এমন কয়েকজন সাধুর প্রয়োজন, যারা শুধু ধ্যান-ভজন নিয়েই থাকবে।"

আমরা মহারাজের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তাঁহার অপরিসীম দয়া, আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমরা বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত হইলাম।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাদিগকে পিতার অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি নবাগত আমাদের কয়েকজনকে একদিন মহারাজের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই সব ছেলেরা নূতন এসেছে। এরা তোমার নিকট দীক্ষা নিতে চায়; এরা সকলেই ভাল ছেলে। তুমি দীক্ষা দিলে এরা কৃতার্থ হবে।" কিন্তু মহারাজ তখন সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না। পরে অন্য এক সময়ে যখন আমরা তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, তখন হঠাৎ বলিলেন,—"তোরা দীক্ষা চাস্? তা বাবা, আগে জঙ্গল পরিষ্কার কর্। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষাদি শিক্ষা কর্। তারপর দীক্ষার কথা বলিস। জঙ্গলে বীজ ফেলে কি হবে?"

কিন্তু শ্রীশ্রীমহারাজ অতি কৃপাপরবশ হইয়া এবার আমাদের কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্য দিলেন। ব্রহ্মচর্যের পরের দিন যখন আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, তখন অতি স্নেহপূর্ণ চক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্, কালী [স্বামী অভেদানন্দ] বল্‌ছে যে তোরা তো আমাদের মত কখনও ভিক্ষা করলি না, সাধুজীবনের কঠোরতাও বুঝলি না, তা এখন যখন তোদের ব্রহ্মচর্য হ'ল তখন তোরা তিন দিন ভিক্ষা ক'রে খা। এ তো ভাল কথা, কি বলিস্?" আমরা মহারাজের অন্তরের কোমলতার কথা বুঝিতে পারিলাম ও বলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, নিশ্চয়ই আমরা তিনদিন ভিক্ষা ক'রে খাবো।"

শ্রীমৎ অভেদানন্দজী মহারাজ দীর্ঘ ২৫ বৎসর পর দেশে ফিরিয়াছেন।

তাঁহাদের সাধন-ভজনের সময় কত কঠোরতা করিয়াছেন। কতদিন অধাশনে, অনশনে বা সামান্য ভিক্ষায় তাঁহাদের দিন কাটাইতে হইয়াছে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া এ কথা আমাদিগকে ও পূজনীয় মহারাজদিগকে প্রায়ই বলিতেন এবং আমরাও আমাদের বর্তমান সাধন-ভজনের সময় ঐরূপ কিছু কঠোরতা কেন করিব না—ইহা লইয়া শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। কিন্তু আমাদের শরীর ও মন যে উহার অনুকূল নহে, দেশের হাওয়াও যে বর্তমানে অনেক বদলাইয়াছে—বহুদিন প্রবাসে থাকায় একথা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না। অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ ইহা বুঝিতেন এবং আমাদিগকে ঐরূপ কঠোরতা করিতে নিষেধই করিতেন।

যাহা হউক, যথাসময়ে আমরা ভিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে যাইতেছি, এমন সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজের একজন সেবক আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ এখনই তোমাদের সকলকে [নূতন ব্রহ্মচারীদের] ডাকছেন।"

আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি পূর্ববৎ সস্নেহে বলিলেন, "তোরা ভিক্ষা করতে যাচ্ছিস তো?" আমরা বলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ!" তদুত্তরে তিনি কোমল হইতে আরও কোমল হইয়া বলিলেন, "দেখ্, তোদের ভিক্ষার জন্যে সূয্যি [সূর্য মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দ, শ্রীশ্রীমহারাজের সেবক] আজ এই পাঁচ টাকা দিয়েছে। তোরা এই দিয়েই আজ বাজার হ'তে চাল প্রভৃতি কিনে নিয়ে আয় এবং মঠের এক গাছের নীচে বসে রান্না ক'রে খা। তাহ'লেই তোদের ভিক্ষার কাজ হবে।"

আমরা শ্রীশ্রীমহারাজের অন্তরের কথা বুঝিলাম; এবং সেইরূপ বাজার হইতে চাউল প্রভৃতি আনিয়া সেইদিন ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করিয়া খাইলাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও আমাদের নিকট আসিয়া 'ভিক্ষান্ন পবিত্রান্ন'

বলিয়া আমাদের নিকট হইতে উহার কিছু চাহিয়া খাইলেন। পরের দুইদিনও, যতদূর মনে পড়ে, আমাদের ভিক্ষার ব্যাপার ঐরূপেই সমাধা হইয়াছিল। বাহিরে একদিনও যাইতে হয় নাই।

এইরূপ মাতৃবৎ কোমল অন্তঃকরণ লইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদিগকে পরিচালিত করিতেন।

এ বৎসর আমাদের কাহারও আর দীক্ষা হইল না। পর বৎসর, ১৯২১ সালে, শ্রীশ্রীমহারাজ ৺কাশী যাইবার পথে কয়েকদিনের জন্য মঠে আসিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কাশীর উভয় আশ্রমের মধ্যে কি লইয়া বহুদিন হইল একটা গোলমাল চলিতেছে। উহা মিটাইবার জন্য স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজকে সেখানে লইয়া যাইতেছেন।

যথাসময়ে মহারাজ ৺কাশী রওনা হইয়া গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম, ঐবিষয়ে তিনি কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, শুধু তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভায় সেখানকার উভয় আশ্রম আলোকিত করিয়া বসিলেন। সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সকালে বিকালে এবং সময় পাইলেই অন্য সময়েও তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক সঙ্গ ও আলাপনে নিজদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সকল গোলমাল, ভেদ-বিবাদ মিটিয়া গেল। সেখানে যাঁহারা কর্মযোগী তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বামীজীর শিষ্যও ছিলেন—যাঁহারা কখনও সন্ন্যাস লইবেন না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,—তাঁহারাও একে একে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আর যাঁহারা কর্মকে সাধন-ভজনের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও স্বামীজীর প্রবর্তিত নিষ্কাম কর্মের মর্ম বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে আপনাদিগকে তাহাতে নিবেদিত করিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজের আধ্যাত্মিক প্রভাবে শুধু আমাদের আশ্রম দুটি নয়, সমগ্র কাশীধাম আনন্দে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এই সময়ে ৺কাশী অদ্বৈত আশ্রম হইতে জনৈক সাধু তাঁহার এক গুরুভ্রাতাকে এ

বিষয় লিখিয়া জানাইলে তিনি আনন্দে ভরপুর হইয়া ঐ চিঠিখানি লইয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে উহার মর্ম নিবেদন করিলেন। আমরা দেখিলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ঐ চিঠিখানি তাঁহার হাত হইতে চাহিয়া লইলেন এবং পুনঃ পুনঃ উহাতে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তা হ'বে না? তা হ'বে না? যাঁকে চকিতে দর্শন করলে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হ'য়ে যায়, তাঁকে যিনি সতত দর্শন করছেন, তাঁর উপস্থিতিতে ঐরূপ হ'বে না! ঐরূপ হবে না! লিখে দাও শ্রীশ্রীমহারাজের ঐ পুণ্য সঙ্গ হ'তে কেউ যেন বিচ্যুত না হয়। সকলকে প্রাণ ভরে তাঁর এই পুণ্য সঙ্গ উপভোগ করতে বলো।"

আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলাম। বুঝিলাম, ইঁহারাই ইঁহাদের পরস্পরকে বুঝিতে সক্ষম। আমরা আর কতটুকু বুঝিতে পারি!

যথাসময়ে ৺কাশীকে আনন্দরসে ভরপুর করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি খুবই উদার। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তারকদা, এবার আমি এদের [আমাদের দেখাইয়া] দীক্ষা দেবো ঠিক করেছি। তবে এবার আর খালি হাতে হবে না। প্রত্যেককে ১০১৲ টাকা ক'রে দক্ষিণা দিতে হ'বে, কি বলেন?" মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের রহস্য বুঝিতেন, তিনিও মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"ঠিকই তো, খালিহাতে কেন দেবে? এরা ১০১৲ টাকা যোগাড় করুক।" তাঁহারা উভয়েই জানিতেন, আমরাও জানিতাম, উহা যোগাড় করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

যথাসময়ে আমাদের দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষান্তে আমরা শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিলাম; কিন্তু ১০১৲ টাকা দিয়া নহে, সামান্য কিছু ফুল-ফল দিয়া, যাহা শ্রীশ্রীমহারাজই নিজ হাতে আমাদের তুলিয়া দিয়াছেন। আমরা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলাম। তাঁহার

স্নেহময় দৃষ্টিতে, তাঁহার দিব্য স্পর্শে আমাদের হৃদয় ভরপুর হইয়া গেল। কিন্তু তখন আমরা ভাবিতে পারি নাই যে, এই আনন্দ এক ভবিষ্যৎ মহা নিরানন্দের সূচনা করিতেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ এবার 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া' দিতেছেন। নির্বিচারে তাঁহার শেষ স্নেহের কণাটুকু দিয়া তিনি আমাদের সকলকে ধন্য করিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পর ব্যক্তিগত কাজে আমাকে একটু পূর্বাশ্রমে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে একদিন একাকী বসিয়া আছি, হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীমুখখানি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, ইনিই আমার সর্বাপেক্ষা আপন, আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আমার গুরু, আমার ইষ্ট, আমার জীবনের একমাত্র পথ-প্রদর্শক। খুব সম্ভব, ইহারই পরের দিন মঠ হইতে আমার এক বন্ধুর চিঠি পাইলাম,—"মহারাজ কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শীঘ্র চলিয়া আইস।" আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরদিনই চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সমস্ত মঠ নীরব, নিথর। সকলেই যেন কি এক মহা অশুভের আশঙ্কা করিতেছেন। বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীমহারাজ অসুস্থ হইয়া আছেন। আর দলে দলে সাধুগণ সেখানে তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিতে ছুটিতেছেন। আমরাও সেখানে গিয়া তাঁহার পুণ্য-দর্শন পাইলাম। ইহার দু'একদিন পরে শুনিলাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত সকল সাধুকে পূর্বরাত্রে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া দিব্য আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং তিনি যে সেই ব্রজের রাখাল, যাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর দিব্যচক্ষে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা করিতে দেখিয়াছিলেন, ভাবমুখে এই কথা তিনি পুনঃ পুনঃ সকলকে শুনাইয়াছেন। অন্যান্য মহারাজগণ বুঝিলেন, আমরাও বুঝিলাম,—এইবার তাঁহার লীলা-সংবরণের দিন আসিয়াছে। ইহার দুইদিন পরেই ১৯২২-এর ১০ই এপ্রিল তিনি লীলা সংবরণ করিয়া দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে মঠে আমরা কয়েকটি অল্পবয়স্ক সাধু বসিয়া আছি। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—"ভাই, মহারাজ চলে গেলেন। আমার কিন্তু ভাই, মনে হ'ত মহারাজ আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভাল-বাসতেন।" তখন আর একজন বলিলেন, "আমারও ভাই ঐরূপই মনে হ'ত।" [অর্থাৎ তাহাকেও শ্রীশ্রীমহারাজ সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন।] আর একজনও অনুরূপ কথা বলিলেন। তখন আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিক বয়স্ক একজন সাধু বলিলেন,—"দেখো, মহারাজের ভালবাসা ছিল অগাধ সমুদ্রের মত। তারই দু' এক বিন্দু জল ছিটিয়ে তিনি আমাদের পরিতৃপ্ত করতেন। আর আমরা ভাবতাম—গোটা সমুদ্রটিই বুঝি আমরা পেয়ে গেছি। কিন্তু, সমুদ্র—যে-সমুদ্র সে-সমুদ্রই থেকে গিয়েছে।" এইরূপ ছিল তাঁহার কামগন্ধহীন সর্বকল্যাণকারী অফুরন্ত, অপূর্ব ভালবাসা।

ইহার বহুবৎসর পরে আমরা কনখলে [হরিদ্বারে] গিয়াছিলাম। সেখানে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় কল্যাণ মহারাজ, আমরা যাহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মতিথি দিবসে কিছু কিছু বলিতে বলিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ৺কাশী প্রভৃতির কথা উঠিলে আমি একটু হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ খুব চালাক ছিলেন।" ইহাতে কল্যাণ মহারাজ খুব ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি তাঁকে কি বুঝেছ, ছোকরা? তিনি চালাক ছিলেন? স্বামীজী ছিলেন সূর্যের মত। তাঁর কাছে আমরা কেউ ঘেঁষতে পারতাম না। আর মহারাজ ছিলেন চন্দ্রের মত। তাঁর স্নিগ্ধ আলোয় আমরা সকলেই পরিতৃপ্ত হ'তাম। তাঁর কথা আমরা সকলেই শুনতাম। তিনি শুধু সঙ্ঘকর্তা ব'লে নয়; আমরা প্রত্যেকেই জানতাম, তিনি আমাদের যা ব'লেছেন তা' আমাদেরই পরম কল্যাণের জন্য। এজন্য নির্বিচারে আমরা সকলে তাঁর কথা শুনতাম। তিনি বুদ্ধিমান বা চালাক-ছিলেন

ব'লে নয়।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া সেদিন আমরা অন্তরে অন্তরে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, ইহাই হইল শ্রীশ্রীমহারাজের যথার্থ পরিচয়।

শ্রীশ্রীমহারাজের স্নেহের অভিব্যক্তির কথা এখানে একটু লিখিলে, বোধহয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উহা ছিল সাধারণ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, আমরা দেখিয়াছি, তাহার প্রতি একেবারে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতেন। সে হয়ত দিনের পর দিন অন্যের সহিত তাঁহার সামনে বসিয়া আছে। তিনি সেই সকল ব্যক্তির সহিত হয়ত কথা কহিতেছেন বা তাহাদের লইয়া অন্য নানা প্রকারের আনন্দ করিতেছেন, কিন্তু সেই স্নেহভাজনের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইতেছেন না। হঠাৎ একদিন তাঁহার সেই দিব্য অমৃতবর্ষী চক্ষু লইয়া তিনি তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। আর দিনভোর সেই আনন্দের রেশ তাহার হৃদয়ে রহিয়া গেল। আর যদি কৃপা করিয়া তিনি তাহাকে একবার স্পর্শ করিতেন তো সে আনন্দ অন্ততঃ তিনদিন তাহার মনে স্থায়ী হইয়া রহিল! ইহা কোন অতিরঞ্জন বা কল্পনার কথা নয়। উপভোক্তাগণের নিজমুখে আমরা ইহা শুনিয়াছি এবং উহার একটু-আধটু ছিটা-ফোঁটা আমাদেরও সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। এইরূপই ছিল এই অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক ভালবাসা—যাহার কণামাত্র পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

স্বামী শিবানন্দ

যাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় আমার সাধুজীবন বর্ধিত হয়েছে, পূজনীয় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ [স্বামী শিবানন্দ] তাঁদের অন্যতম। যখন আমি মঠ-মিশনে প্রথম প্রবেশলাভ করি, তখন মঠ-মিশন সম্বন্ধে আমার খুব অল্পই জ্ঞান ছিল; শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের অপরিসীম স্নেহ-যত্ন না পাইলে মঠ-মিশনে টিকিয়া থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। পূজনীয় হরি মহারাজের আদেশে পাঠ সমাপন করিবার জন্য কাশী থেকে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম খুব সম্ভব ১৯১৯ সালে। কিন্তু পাঠ-সমাপন হইল না। অধিকতর মনোযোগ দিয়া যখন পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তখন একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মঠে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। ইতঃপূর্বে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কিছু আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। আমি ৺কাশীতে থাকি এবং পূজনীয় হরি মহারাজের কাছে যাই শুনিয়া মহাপুরুষজী স্নেহের সঙ্গে আমাকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তারপর আরও দু-একবার মঠে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, তাহাও তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলাম। মঠে জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সে সময়ে আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাকে আমার পরীক্ষার পূর্বের ও পরের মানসিক সকল অবস্থার কথাও বলিয়াছিলাম। যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিন খুব সম্ভব পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মতিথি। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মঠে পৌঁছিয়াছিলাম। তখন উৎসবাদি একরকম শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া ব্রহ্মচারীজী সোৎসাহে বলিলেন, "ও! আজ তো খুব ভাল দিনে এসেছ দেখছি। চল, তোমাকে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে যাই।" ব্রহ্মচারীজী ইতোমধ্যে তাঁহার কাছে গিয়া আমার বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন

কিনা জানি না, কিন্তু মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমার দিকে স্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে… এখন তুমি কি করবে?" তাঁর এ কথাটি আমার এখনও বেশ মনে আছে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, "যদি দয়া ক'রে আপনাদের আশ্রয়ে রাখেন তো এখানেই থাকব।" একথা তখন যে কি করিয়া আমার মুখ দিয়া বাহির হইল এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি না; কেননা, তার জন্য তখন তো একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তার উত্তরে আমাকে ততোধিক বিস্মিত করিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "চলে এস, চলে এস, তোমাদের জন্যই তো স্বামীজী এইসব মঠ ক'রে গিয়েছেন।" অত্যন্ত পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে আসব?" বলিলেন, "যেদিন ইচ্ছা, কালই আসতে পার।" পরে একটু মাথা নাড়িয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, "তবে মঘা, অশ্লেষা ও বৃহস্পতিবারের বারবেলা বেছে এসো। শ্রীশ্রীঠাকুর এসব মানতেন, জান তো?" তথাকথিত ইংরেজ-শিক্ষিত আমরা হয়ত তা মানি না বলিয়াই বোধহয় ঐরূপ বলিয়াছিলেন। যাহা হউক পরদিনই মঠে চলিয়া আসিলাম। ইহার জন্য অন্য কাহাকেও যে কিছু বলিতে হইবে তাহা জানিতাম না, কাজেই সন্ধ্যার পর আমাকে মঠে দেখিয়া অনেকেই নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, তবুও দিলাম। সর্বপ্রথম ঐদিন মঠে রাত্রিবাস করিলাম। কঠোরতায় অনভ্যস্ত আমরা উপাধানবিহীন শয্যায় শুইয়া সে রাত্রিতে শীতে ঘুমাইতে পারি নাই। সকালে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি সর্বপ্রথম রাত্রে ঘুম হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সসঙ্কোচে সব নিবেদন করিলাম, তিনি দুঃখিত হইয়া মঠের তদানীন্তন পরিচালককে ঐ বিষয়ে আরও অবহিত হইতে বলিলেন।

আনন্দে মঠে দিন কাটাইতে লাগিলাম। বোধহয় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রোজ সকালে মঠে তিনি পাদচারণা করিতেন, একদিন হঠাৎ আমাকে বলিলেন, "চল, আজ আমার সঙ্গে বেড়াবে এসো, তোমার কথা সব শুনতে হবে।" বেড়াইতে বেড়াইতে আমার তখনকার মনের অবস্থার কথা জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, "মহারাজ, পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে আপনাদের সজ্যে যোগ দেব—একথা মাঝে মাঝে মনে উঠেছে, আবার এখানে থাকতেও খুবই ভাল লাগছে।" শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "দেখ, তা হ'লে পরীক্ষাই দাও, জান তো শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন যে, গুবরে পোকা তার মুখে একটু গোবর লাগিয়ে নানাদিকে ঘুরে বেড়ায়; কত সুগন্ধি ফুলের বাগানের ভেতর দিয়ে হয়তো যাচ্ছে, কিন্তু ঐ গোবর-টুকুর জন্য অন্য কোন গন্ধই পায় না। তোমারও ঐরূপ বাসনা থাকলে তা আগে পূরণ ক'রে এসো, পরে না হয় সাধু হবে।" কিন্তু আমি পরের দিনই তাঁহাকে বলিলাম, "না, মহারাজ, আমার সে বাসনা গিয়েছে, দয়া করিয়া আপনাদের আশ্রমেই আমাকে রাখুন।"

তদবধি তাঁহাদের আশ্রয়েই রহিলাম। নানারূপ সংস্কার লইয়া সাধু হইতে গিয়াছি; কাজেই মাঝে মাঝে সেগুলি মাথাচাড়া দিয়া উঠিত। মঠের সাধুরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নানাপ্রকার সেবা করিতেন, কিন্তু আমি ভাবিতাম এ সবে বৃথাই সময়ক্ষেপ করা,—জপধ্যান নিয়েই তো তাঁহাদের থাকা উচিত। জানি না, আমার মনের এই ভাব মহাপুরুষজী টের পাইয়াছিলেন কি না। অন্য একদিন যখন তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম, তখন কয়েকজন সাধু মঠের সবজির বাগানে জল দিতেছিলেন, তাঁহাদের দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, দেখ, এরা কেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করছে।" পূর্বে দেশ ও দশের কিছু সেবা করিয়াছি। সাধুদের এ সব কাজ তার তুলনায় তুচ্ছবোধ হইত, তাই বলিলাম, "মহারাজ, হাঁ, কিন্তু

এ তো ছেলেমানুষী বলে মনে হয়; এ জাতীয় কাজ তো ইতঃপূর্বে আমরা অনেক করেছি।" তিনি আমার কথা বুঝিলেন, এবং বলিলেন, "হাঁ, তবে এ তো শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ।" তখনও ঐ কাজগুলি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার অঙ্গ এবং আমাদের পূর্ব-কাজগুলি অহঙ্কার-মিশ্রিত ছিল তাহা বুঝি নাই, তাহা বুঝাইবার জন্যই বোধহয় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ঐরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

রোজ সকাল-সন্ধ্যায় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য-সঙ্গ-লাভ করিয়া সত্যই নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। সকালে ও সন্ধ্যায় দীর্ঘ দু' ঘণ্টা তিনি মঠের পুরাতন মন্দিরের ভিতর ধ্যান করিতেন। আমরাও বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম, আমাদের এ ক্ষুদ্র চেষ্টাকেও তিনি বড় করিয়া আমাদের সামনে ধরিতেন এবং আমাদের ঐভাবে চেষ্টা করিতে দেখিলেই "লাগো, উঠে-পড়ে লাগো" বলিয়া কখনো কখনো আমাদের উৎসাহ দিতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় ধ্যানাদির পর তন্ময়ভাবে তিনি তাঁহার ঘরে ও কখনো উত্তরের বারান্দায় বেঞ্চে বসিতেন, আমরাও একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিতাম; ধীর গম্ভীরভাবে তখন তিনি আমাদের নাম ধরিয়া "কেমন আছ, স্থ?" ইত্যাদি কথা বলিতেন। সেই সুমধুর গম্ভীর আহ্বানেই কিন্তু আমাদের মন ভরিয়া যাইত, মনের সব সংশয় দূর হইত। মনে হইত আমরা যেন আনন্দের খনির আস্বাদ পাইয়াছি, সকল সংশয় ইঁহাদের কৃপায় শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে।

প্রায় আড়াই বছর অবিচ্ছিন্নভাবে মঠে বাস করিয়া মঠ-কর্তৃপক্ষের আদেশে ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি মিশন কেন্দ্রে কর্মিরূপে প্রেরিত হইলাম। মঠ থেকে পূজনীয় মহাপুরুষজী প্রভৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে একেবারেই মন চাহিতেছিল না, তবুও তাঁহাদের আদেশ বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহারই একসময়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম

করিয়া বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, দূরে যাচ্ছি, আমাদের কথা মনে রাখবেন।" শুনিয়াই কিন্তু তিনি বলিলেন, "দূরে যাচ্ছ! কোথায় যাচ্ছ? যেখানেই যাবে সেখানেই তো তিনি আছেন, তাঁরই আশ্রমে যাবে। দূর কোথায়?"

আর একদিন ঐভাবে অন্যত্র যাবার কালে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, আশীর্বাদ করবেন।" শুনিয়াই মহাপুরুষজী বলিলেন, "আশীর্বাদ? দেখ, আমাদের মুখ থেকে কখনও অভিশাপ বের হয় না। তোমাদের যা বলেছি, যদি তিরস্কারও ক'রে থাকি তো তা সবই আশীর্বাদ ব'লে জানবে।" কাশী থেকে কলিকাতায় আসিবার সময় পূজনীয় হরি মহারাজের মুখেও অনুরূপ কথা শুনিয়াছিলাম।

অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ যখন মধুপুরে ৺পূর্ণ শেঠের বাগানবাড়ীতে ছিলেন তখন একদিন আমাদের জীবনের দৈন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, সাধন-ভজন ক'রে কিছুই ত হচ্ছে না।" তিনি তখন দুপুরের আহারের পর একটু বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়াছিলেন, আমার কথা শুনিয়াই কিন্তু উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "দেখ, ছোট ছেলে অসুখ থেকে সেরে উঠলে মাকে বলে,—'মা, আমায় ভাত দাও, আমি একথালা ভাত খাব।' মা কিন্তু জানেন তার পেটে কতটুকু সইবে, তাই ধীরে ধীরে তার যতটুকু সইবে ততটুকুই দিয়ে যান, পরে তা যখন স'য়ে যায় তখন হয়ত আরো বেশী দেন; তোমাদেরও তাই হয়েছে, তিনি সময় বুঝে সব দিয়ে দেবেন।"

এধরনের উৎসাহের কথা তাঁহার মুখে একাধিকবার শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। একদিন তিনি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক স্পিনোজা [Spinoza]-র দর্শন তাঁর ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পড়িতেছিলেন, হঠাৎ আপনমনে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, বেড়ে তো লিখেছে!" আমি তখন নিঃশব্দে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাঁহার পড়ার ব্যাঘাত

হইবে মনে করিয়া ইতঃপূর্বে কোন কথা বলি নাই। হঠাৎ আমাকে কাছে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ওহে, তোমরা কি এ বই পড়েছ?" কলেজে পড়িবার সময় ঐ বই পড়িয়াছিলাম, তাই বলিলাম,—"হাঁ, মহারাজ, পড়েছি।" তিনি তখন বলিলেন, "দেখ, দেখ, কেমন লিখেছেন। ভগবানের সম্বন্ধে বলছেন: To define Him is to limit Him; to determine Him is to negate Him; of Him we can only say that He is.—অর্থাৎ ঈশ্বরকে কোন সংজ্ঞা দিতে গেলে সীমাবদ্ধ করা হয়, তাঁর বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে গেলে তিনি যা ন'ন তাই বলা হয়; তাঁর সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলতে পারা যায় যে, 'তিনি আছেন।' দেখ, ঠিক আমাদের বেদান্তের মতোই 'তিনি সৎ' এইমাত্র বলা হচ্ছে, এ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।" বলিয়াই আবার বলিলেন, "দেখ, দেখ, He is—এর পরেই লিখছেন—'It is better to say that It is'—দেখ, দেখ, তিনি যে লিঙ্গালিঙ্গ-বর্জিত তা-ই এখানে বোঝাবার চেষ্টা করছেন; ঠিক আমাদেরই 'ওঁ তৎ সৎ'-এর মতো। তাঁকে 'তৎ' ব'লে নির্দেশ করছেন, 'সঃ' বা 'সা' কিছুই নয়, তিনি সত্যই এরূপ।" শুনিয়া বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, ঐ 'সৎস্বরূপ' সম্বন্ধে তো কিছুই বুঝতে পারি না, তবে ধ্যান ক'রে কিছু আনন্দ পাই ব'লে তাঁকে মনে হয় 'আনন্দস্বরূপ'।" শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছ, তবে, বাবা, তাঁর কৃপায় যখন তাঁর যথার্থ আস্বাদ পাবে, তখন দেখবে তিনি আনন্দ নিরানন্দ উভয়েরই পারে।"

তিনি চিরদিন উদাসীন ছিলেন, তাঁহার আচার-ব্যবহারে উদাসীনতার ভাবই প্রকাশ পাইত। তাঁহার বাহিরের দিকটি অত্যন্ত কঠিন বর্মে আবৃত হইলেও ভিতরের দিকটি অত্যন্ত কোমল ছিল। তাঁর স্নেহাদির কথা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। ঢাকা থেকে একবার মঠে আসিয়াছি, তখন নানা কারণে শরীর খুবই কৃশ হইয়া গিয়াছিল। পূজনীয় মহাপুরুষ

মহারাজ পশ্চিমের বারান্দায় একটি বেঞ্চে বসিয়াছিলেন, দূর থেকে আমাকে খালি গায়ে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্থ—একদম পালওয়ান হো গিয়া!" অর্থাৎ ঢাকায় গিয়া খুব জোয়ান হইয়াছ দেখিতেছি। তিনি অবশ্য রহস্য করিয়াই তাহা বলিয়াছিলেন। সেইরকমই আবদারচ্ছলে তাঁহাকে বলিলাম, "হাঁ, মহারাজ,—তা আপনার শরীর ভাল আছে তো?" ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজের ভিতর ডুবিয়া গেলেন; বলিলেন, "আমাদের শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছ? দেখ, তাঁর কৃপায় এ ছাঁচে যা উঠবার সব উঠে গেছে! বুঝেছ, সব উঠে গেছে।" এ কথাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাবে বারবার বলিতে লাগিলেন। আমরা তো অবাক! এ ভাবে তাঁহাকে নিজের সম্বন্ধে অন্য কোন সময়ে বলিতে শুনি নাই।

অবশ্য, তাঁহার শরীর-বোধরাহিত্য অনেক সময় দেখিয়াছি; অত্যন্ত অসুস্থতার সময়ে তিনি কেমন আছেন ডাক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মুখ থেকে প্রথমেই শোনা যাইত—"আমি ভালই আছি," অথচ তখন অত্যন্ত শ্বাসকষ্টে ভুগিতেছিলেন। ডাক্তার [অজিত রায় চৌধুরী] তাঁহার ভাব জানিতেন, তাই বলিতেন, "হাঁ, মহারাজ, আপনি তো ভালই আছেন, তবে এ শরীরটার কথা জিজ্ঞেস করছি।" তখন আপন-ভোলা মহাপুরুষ নিকটে সেবককে বলিতেন, "বল্, কেমন আছি, কাল কেমন ছিলাম।" সেবকও ছোট ছেলেকে বুঝাইবার মতো বলিতেন, "ভালই আছেন, কাল বেশ ঘুমিয়েছেন," ইত্যাদি। তিনি সে-কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখ বেশ ভালই আছি, কাল বেশ ঘুমিয়েছি"—ইত্যাদি। জানি না পরে তাঁহার সেবকগণ ডাক্তারকে তাঁহার শরীরের যথার্থ অবস্থার কথা বলিতেন কিনা। সাধারণ কেহ তাঁহাকে শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "দেখ, এ শরীর! এ ষড়্‌বিকার-শীল শরীর—জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি—এর এই ছ' অবস্থা, এ হবেই। এর কথা ভেবে কি হবে?"

আমরা যখন মঠে প্রথম যোগদান করি তখন ৺কাশী, হিমালয় প্রভৃতি স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি সবেমাত্র মঠে আসিয়াছেন। কঠোর তপস্বীর ভাব তাঁহার সকল আচার-ব্যবহারে তখনো বিদ্যমান। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি বরাবরই স্বাবলম্বী ছিলেন—তাঁহার কোন নির্দিষ্ট সেবক ছিল না। তখনকার দিনে মহাপুরুষজী লোকজনের সঙ্গ বেশী পছন্দ করিতেন না, তাই অনেকেই তাঁহার কাছে যাইতে ভয় পাইত।

পরে দেখিলাম তাঁহার সে ভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দজী] স্থূলদেহে থাকাকালে মহাপুরুষ মহারাজ কাহাকেও বড় দীক্ষা দেননি। কেহ তাঁহার কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি ফিরাইয়া দিতেন এবং বারবার চাহিলে পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজকে দীক্ষার জন্য ধরিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের শরীর যাইবার কিছু পূর্বে তাঁহার আদেশ পাইয়া মহাপুরুষজী স্বামী অভেদানন্দজীর সঙ্গে ঢাকায় যান এবং শ্রীশ্রীমহারাজেরই অনুমতিক্রমে সেখানে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীমহারাজেরই ঢাকা যাইবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি যাইতে পারিবেন না বুঝিয়া মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে···সেখানে দীক্ষার্থীদের কি হবে? তুমি না গেলে কে তাদের দীক্ষা দেবে?" শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের সামনেই হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "তারকদা, হাত খুলুন"—অর্থাৎ আপনার সঞ্চিত শক্তি এবার অকাতরে বিতরণ করুন। শ্রীশ্রীমহারাজ সত্যই তাঁহাকে দীক্ষা দিতে বলিতেছেন কি না তাহা জানিবার জন্য তিনবার তিনি তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ও তিনবারই ঐ একই উত্তর পাইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে তাই হবে। জয় শ্রীগুরুমহারাজ!" ইত্যাদি। তাহাই হইল। মহাপুরুষজী ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে অকাতরে দীক্ষা দিলেন। পরে পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের শেষ অসুখের সংবাদ পাইয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমহারাজের শরীর গেল ; মঠ-মিশনের সব দায়িত্ব পড়িল তাঁহার উপর। তখন দেখিলাম তাঁহার স্বভাব একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। দীক্ষা দিবার সময় বলিতেন, "আমি কারো গুরু নই, শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমাদের গুরু—আমি তোমাদের তাঁর চরণে সমর্পণ করেছি মাত্র।"

শেষের দিকে কাহাকেও তিনি বিমুখ করিতেন না। মনে পড়ে একবার বরিশাল হইতে কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। আমি তখন বরিশালে থাকিতাম। ভক্তগণ দীক্ষার্থী জানিয়া আমি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়া দেখি তিনি তখন হাঁপানিতে খুবই কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার সেবক বলিলেন, "এ অবস্থায় দীক্ষার কথা তোলা একেবারে অসম্ভব।" আমারও মনে তেমনি ধারণা হইল, কিন্তু পরে আবার তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি তিনি কিছু সুস্থ হইয়াছেন ; তখন ধীরে ধীরে সেই ভক্তদের দীক্ষার কথা তুলিলাম। শুনিয়া পরম কারুণিক মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাদের ডাকিলেন এবং ঘরে বসিয়াই তাঁহাদের কৃতার্থ করিলেন।

এইভাবেই দীর্ঘ আশি বৎসর বা ততোধিক কাল নরদেহে থাকিয়া মহাপুরুষজী কঠোর সাধুজীবন যাপন করিয়া এবং আপামর সাধারণকে অপার করুণা দেখাইয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহার স্নেহ-ভালবাসায় শুধু আমরা কেন, দীন, দুঃখী, দুঃস্থ, আর্ত সকলেই ধন্য হইয়াছেন ; আজও সে কথা স্মরণ করিয়া মনে সান্ত্বনা পাই—"হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ !"

স্বামী সারদানন্দ

'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥'

—গীতা, ৪।১৮

গীতায় কোন্‌টি কর্ম ও কোন্‌টি অকর্ম অর্জুনকে বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। উহার সাধারণ অর্থ—কর্মে যিনি অকর্ম ও অকর্মে যিনি কর্ম দেখেন তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনি বিভিন্ন প্রকার কর্ম করিলেও কখনও কর্মের দ্বারা লিপ্ত হন না। এই কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম কি তাহা লইয়া বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নরূপ ভাষ্য বা টীকা করিয়াছেন।

খুব সম্ভব ঐ শ্লোকটির উপরেই কর্মযোগ-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেনঃ আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন,······যান-বাহন-মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে; ইহাই কর্মযোগের আদর্শ।

স্বামীজীর এই কর্মযোগীর আদর্শ আমরা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে মূর্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম। শত কাজ ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও দেখিতাম তিনি ধীর, স্থির ও শান্ত, কর্মকোলাহলপূর্ণ কলিকাতার পল্লীতে অবস্থান করিলেও মনে হইত সত্যই তিনি মরুভূমির নিস্তব্ধতা উপভোগ করিতেছেন এবং যখন কর্মবিরত অবস্থায় শান্তভাবে বসিয়া থাকিতেন তখনও মনে হইত শুধু মঠ-মিশন কেন, বহুজনের কল্যাণ চিন্তায় তিনি নিমগ্ন, তাঁহার বিশাল হৃদয়ে কত দীনদুঃখী যে স্থান পাইত তাহার ইয়ত্তা নাই।

মঠে যোগদানের পর আমরা যখন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলাম তখন 'উদ্বোধন' অর্থাৎ 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'কে মনে হইত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একটি বিচিত্র কর্মশালা। শ্রীশ্রীমায়ের সবেমাত্র শরীর গিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের সহচারিণী বা সেবিকা গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। যোগীন-মার আশ্রয়শূন্য দৌহিত্রগণও তখন উদ্বোধনে আশ্রয় পাইয়াছেন, আবার জয়রামবাটীর এবং শ্রীশ্রীমায়ের আত্মীয়া রাধু প্রভৃতির সকল খবর এখান হইতে রাখিতে হইতেছে। ইঁহাদের সকলের ভার পূজনীয় শরৎ মহারাজের উপর।

মঠ-মিশনের সকল কার্যও তখন উদ্বোধন হইতেই হইত। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ [স্বামী শিবানন্দজী] তখন মঠ-মিশনের সহাধ্যক্ষ [Vice-President] এবং বেলুড় মঠের কার্যাধ্যক্ষ থাকিলেও বহুদিন কঠোর তপস্যায় জীবন-যাপন করায় তাঁহার পক্ষে মঠ-মিশনের বিবিধ কর্মের মধ্যে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হইত না। মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দজী] উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে সর্বদা অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার পক্ষেও কর্মক্ষেত্রে নামিয়া সমস্ত কিছু দেখা-শুনা করা বা পরিচালনা করা সম্ভব হইত না। কাজেই মঠ-মিশনের সকল কাজই পূজনীয় শরৎ মহারাজকেই দেখিতে হইত। অনলস ও অতন্দ্র কর্মিরূপে তিনি সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতেন। পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ এই কালে বেশীর ভাগ সময়ই ভুবনেশ্বরে থাকিতেন। কেবল মঠ-মিশনের কোন বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইলে বা কোন বিশেষ কার্যের জন্য প্রয়োজন হইলে স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন ও বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে মঠে বা প্রয়োজনীয় অন্যস্থানে লইয়া গিয়া ঐ সমস্যার সমাধান করিতেন এবং সমস্যাটির সমাধান হইলেই তাঁহাকে আবার তাঁহার অধ্যাত্মরাজ্যে নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে দিতেন।

উদ্বোধনে তখন যে-সকল সাধু থাকিতেন তাঁহারা কর্মী হইলেও সকলেই ধীর-মস্তিষ্কের ছিলেন না, কিন্তু এই নানাপ্রকার বিপরীত অবস্থাতেও পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজীকে আমরা কখনও বিচলিত হইতে দেখি নাই। ধীর, স্থির, সুদক্ষ কর্মবীরের মত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘকে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করাইয়া উহার সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেন।

দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত, দুঃস্থ ও আর্তদিগের সেবাও তখন মিশনের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ছিল। যেখান হইতেই ঐরূপ সেবার আহ্বান আসিত মঠ-মিশনের কর্মীর সংখ্যা তখন অতি অল্প থাকিলেও পূজনীয় শরৎ মহারাজ অচঞ্চল চিত্তে তৎক্ষণাৎ সেখানে আর্তত্রাণ কার্যের জন্য কর্মী পাঠাইয়া দিতেন। সেবক পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না ; আর্তত্রাণের ও কর্মীদিগের সকল খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়মিতভাবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে হইত, তিনিও নিয়মিতভাবে উহা চালাইবার উপদেশ দিতেন। ঐ কার্যের কোনরূপ শিথিলতা বা ব্যয়বাহুল্য দেখিতে পাইলে তিনি কর্মীদিগকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিতেন ও পুনরায় কখনও উহা না হয় তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিতেন। কিন্তু বাহিরের কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন সঙ্ঘ সেবকদিগের ঐ সকল কার্যের কিছুমাত্র অন্যায় সমালোচনা করিলে তিনি সিংহবিক্রমে উহার অসারতা প্রমাণ করিয়া দিতেন এবং সেবকদিগকে ঐসকল কথায় কর্ণপাত করিতে নিষেধ করিয়া তাহাদের নিজেদের কার্যে অবহিত হইতে বলিতেন। রাজশাহী জেলায় নওগাঁয় বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করিবার সময় আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দীর্ঘ দুই মাস সেবাকার্যের পর ওখানে উহার আর কোন প্রয়োজন না থাকায় পূজনীয় শরৎ মহারাজের নির্দেশক্রমে ঐ কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার কার্যনিরত কোন কোন নূতন সঙ্ঘ হইতে উহাতে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল ; সংবাদপত্রেও

ঐ বিষয়ে নানারূপ সমালোচনা বাহির হইল; কিন্তু পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাহাদের সকলের কথা তুচ্ছ করিয়া সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিলেন যে, দীর্ঘকাল সেবাকার্যের অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন্ সেবাকার্য কখন আরম্ভ করিতে হইবে এবং কখন উহার পরিসমাপ্তির প্রয়োজন হইবে তাহা মিশন বিশেষরূপে অবগত আছে, যাঁহারা নব উৎসাহ লইয়া আরও অধিককাল ঐ কার্য-পরিচালনা করিতে চান তাঁহাদিগের এই বিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক। পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঐ কথা লইয়া তখন পত্রিকাদিতে নানারূপ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পূজনীয় শরৎ মহারাজ অচঞ্চল রহিলেন ও পরে সর্বসাধারণ তাঁহার কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিলেন।

মিশনের কার্য সম্বন্ধে সেই সময়ে ইংরাজ সরকার বাহিরে কিছু না বলিলেও উহা খুব সুনজরে দেখিতেন না। ঢাকার দরবারে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভাষণদানকালে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল মিশনের উপর বিরূপ কটাক্ষ করিয়া যেরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে সর্বজনবিদিত। তাহার ফলে মঠ-মিশনের অনেক ভক্ত ও সভ্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট এই বিষয়ে কি করণীয় তাহার নির্দেশ চাহিয়া পত্রাদি দেন; তাহার উত্তরে তিনি তাঁহাদিগকে অবিচলিত থাকিয়া ও কোনরূপ ভীত না হইয়া সত্যকে ধরিয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন এবং মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে তিনি স্বয়ং লর্ড কারমাইকেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা এবং মিশনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে লর্ড কারমাইকেল আর একটি বক্তৃতায় তাঁহার পূর্ব-মন্তব্য প্রত্যাহার করেন।

আর একটি ঘটনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যাহাতে পূজনীয় শরৎ মহারাজের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। বরিশাল জেলায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে

ভান্নকাঠি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্য শুরু করা হয়। ঐ অঞ্চলে কয়েকটি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় সংবাদপত্রে ঐ সংবাদ প্রকাশ করেন ; ফলে তিনি রাজরোষে পতিত হন এবং উক্ত আশ্রমে পুলিশ পুনঃ পুনঃ আসিয়া তাঁহাকে ঐ উক্তিটি প্রত্যাহার করিতে বলে। এই বিষয়ে কি কর্তব্য, পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট জানিতে চাহিলে মহারাজ লিখিলেন, "কখনও তুমি সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। যদি ঐ ঘটনা সত্য হয় তবে কাহারও ভয়ে তুমি উহা প্রত্যাহার করিও না। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সহায় হইবেন।" অতঃপর যখন ঐ ঘটনা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন রাজরোষও ধীরে ধীরে ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষের উপর হইতে অন্তর্হিত হইল।

কার্যক্ষেত্রে এইরূপ কঠোর, নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ত হইলেও তাঁহার হৃদয় ছিল কুসুম অপেক্ষাও কোমল। কত রাজরোষ-পীড়িত, কত অসুস্থ, অর্ধোন্মাদ ও বিকৃতমস্তিষ্ক সাধুকে যে তিনি তাঁহার নিকটে 'উদ্বোধনে' স্থান দিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজরোষ-নিপীড়িত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ [দেবব্রত বসু] এবং স্বামী চিন্ময়ানন্দ [শচীন] উভয়েই ছিলেন মানিকতলার বোমার ষড়যন্ত্র মামলার আসামী, আত্মপ্রকাশানন্দ [প্রিয়নাথ] ও স্বামী সত্যানন্দ [সতীশ] প্রভৃতিও ছিলেন বিপ্লবী দলের। তাঁহাদের মুক্তির পর তিনি ইঁহাদিগকে স্থান না দিলে ইঁহাদের মঠ-মিশনে স্থান হইত কিনা সন্দেহ।

অদ্বৈত-চৈতন্য প্রভৃতি অর্ধ-উন্মাদদেরও তিনিই ছিলেন পরম আশ্রয়। অদ্বৈত-চৈতন্য আমাদেরই সময়ে সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিল, যথাসময়ে তাহার ব্রহ্মচর্য-দীক্ষাও হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার পর তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। তখন সে কখনও মঠে, কখনও কলিকাতায় বা অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পূজনীয় শরৎ

মহারাজ তাহাকে উদ্বোধনে আশ্রয় দেন ও তাহার সর্ববিধ সেবাশুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে সে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলে পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহার সেবককে যথাসময়ে ঔষধ খাওয়াইতে বলিয়াছিলেন। বিকৃত-মস্তিষ্ক অদ্বৈত কিন্তু ঔষধ খাইতে অস্বীকার করিল। সেবক পূজনীয় শরৎ মহারাজকে ইহা নিবেদন করিলে তিনি স্বয়ং তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাহাকে ঔষধ খাইতে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন, "বাবা অদ্বৈত, ঔষধটি খাও, তোমার অসুখ সেরে যাবে," উত্তরে কিন্তু উন্মাদ জানাইল, "এই সময়েই তো শুধু 'বাবা' বলছ, কই, রসগোল্লা খাওয়ার সময় তো 'বাবা' বল না।" তখন কল্যাণকামী ধীর গম্ভীর শরৎ মহারাজ বলিলেন, "বাবা, এবার তুমি ঔষধ খাও, পরে তোমাকে রসগোল্লা খাওয়ানো হবে"। এইরূপ করুণাময় মহাপুরুষ আর কোথায় দেখা যাইবে?

আমরা আর একটি ঘটনাও অতি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, তাহাতে তাঁহার চিত্ত যে কত কোমল ও ক্ষমাশীল তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হই। অতি দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের একটি সাধু এক সময়ে অত্যন্ত অন্যায় কর্মে লিপ্ত হন। মঠ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উহা হইতে পুনঃ পুনঃ সতর্ক হইতে বলিলেও তিনি প্রারব্ধবশতঃ উহাতে সমর্থ হন নাই। উহা যখন সংশোধনের মাত্রা ছাড়াইয়া গেল তখন মঠ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তাঁহার পূর্বাশ্রমে ফেরত পাঠানোই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন এবং তজ্জন্য দুইজন ব্রহ্মচারী-সহ তাঁহাকে পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; উদ্দেশ্য—মঠ-মিশনের সেক্রেটারীকে জানাইয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া। ব্রহ্মচারিদ্বয় উঁহাকে লইয়া উদ্বোধনে পৌঁছিলে পূজনীয় শরৎ মহারাজ উপরে তাঁহার ঘরে বসিয়াই এ সংবাদ পাইলেন ও তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারী দুইজনকে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন ও নীচে অপরাধী সাধুটির নিকট যাইয়া সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা,

তুই কোথায় যাবি, এখানেই থাক্, তোর সকল ব্যবস্থা আমিই করবো।" সাধুটিও তাঁহার করুণায় বিগলিত হইয়া উদ্বোধনে থাকাই স্থির করিলেন ও কিছুকাল তাঁহার নিকটেই সুস্থচিত্তে অবস্থান করিলেন। কিন্তু প্রারব্ধ বলবান, এত করুণা পাইয়াও শেষ পর্যন্ত তিনি থাকিতে পারিলেন না।

তখন বেলুড় মঠের সাধুগণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে চিকিৎসার ও পথ্যাদির ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হইত, কারণ তখন মঠের আয় স্বল্প ছিল। আমরা শুনিয়াছি, পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ এইজন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ' পুস্তকখানি মুদ্রিত করাইয়া স্বল্পমূল্যে ভক্তদের নিকট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য— বিক্রয়লব্ধ অর্থে অসুস্থ সাধুদিগের সেবা হইবে। ইহাতে নানা কথা উঠে, পূজনীয় শরৎ মহারাজ উহা শুনিয়া একদিন মঠে জ্ঞান মহারাজকে বলেন, "দেখ জ্ঞান, তুমি এই বইখানি আমাকে দাও। এখন হতে মঠের অসুস্থ সাধুদের চিকিৎসা ও সেবার ভার আমিই গ্রহণ করব।" তদবধি বহুদিন পর্যন্ত উদ্বোধনে জায়গা সঙ্কীর্ণ হইলেও মঠের অসুস্থ সাধুগণ আসিয়া সেখানেই অবস্থান করিতেন এবং পূজনীয় শরৎ মহারাজের স্নেহচ্ছায়ায় থাকিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাদি করাইবার সুযোগ লাভ করিতেন।

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ বা স্বামী তত্ত্বানন্দের কথা মনে পড়ে। তত্ত্বানন্দ আমাদের সময়েই মঠে যোগদান করিয়াছিল এবং উদ্বোধনে কর্মিরূপে কিছুকাল ছিল। এই সময়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজ কিছুদিনের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। তখন গোবিন্দ হঠাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। উদ্বোধনে ছোট বাড়ীতে তাহাকে রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া উদ্বোধনের তদানীন্তন পরিচালকগণ তাহাকে কারমাইকেল [বর্তমান আর. জি. কর] মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েকদিন পরেই গোবিন্দ সেখানেই দেহত্যাগ করে।

কিছুদিন পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসেন ও গোবিন্দের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং দুঃখ করিয়া বলেন, "এখন হ'তে আমার অসুখ হলেও তোমরা আমাকে হাসপাতালেই ভর্তি ক'রো।" এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ খেদোক্তি তাঁহার মতো মহাপুরুষের মুখেই সম্ভব।

দীনদুঃখীর তিনি চিরদিনই পিতামাতা। তাঁহার শরীর যাইবার অনেক পরে তাঁহার হস্তলিখিত একটি হিসাবের বই আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে তিনি তাঁহার স্বহস্তে বহু দীনদুঃখীর হিসাব রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। কোন্ বিধবা তাঁহার নিকট কবে কয়টি টাকা রাখিয়াছেন, কোন্ অসহায় ভিক্ষু তাহার ভিক্ষালব্ধ অর্থের কতটুকু তাঁহার নিকট জমা রাখিয়াছে, সবই তাহাতে সুস্পষ্টরূপে লেখা ছিল। আবার সেই অর্থ হইতে কে কবে কত টাকা লইল তাহাও উহাতে উল্লেখ ছিল।

মাতৃজাতির উপর তাঁহার অপার্থিব শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত; 'ভারতে শক্তিপূজা'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তি-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণচিত্তে অর্পিত হইল।" সত্যই তিনি মাতৃজাতিকে ঐরূপ সম্মান চিরদিন দিয়া আসিতেন। তাঁহার শরীর যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে তিনি মঠ-মিশনের কর্মভার নূতন সাধুগণের উপর দিয়া জপধ্যানে দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন; তখনও দেখিয়াছি দ্বিপ্রহরে তাঁহার আহার সমাপ্ত হইবার পূর্বে ও পরে কত গৃহস্থ-ঘরের মহিলাগণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রাণ খুলিয়া অভাব-অভিযোগ নিবেদন করিতেছেন এবং তিনিও সস্নেহে উহা দূর করিবার উপায়সকল তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতেছেন। তাঁহার শরীর গেলে আমাদের মনে হইয়াছিল যে তাঁহারা

এবার সত্যই আশ্রয়শূন্য হইলেন, প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের দুঃখ নিবেদন করিবার বোধহয় আর কোন স্থান রহিল না।

মঠে যোগ দেওয়ার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সৌভাগ্য আমাদের খুব কমই হইয়াছিল। বেলুড় মঠে থাকিতাম, কোন বিশেষ কাজে কলিকাতায় আসিতাম। তখন অল্প সময়ের জন্য পূজনীয় মহারাজের দর্শন পাইতাম, আবার কার্যোপলক্ষে তিনি মঠে গেলে কখনও তাঁহার অল্প-স্বল্প সেবা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে উদ্বোধনে প্রথম দেখার কথা আমার বেশ মনে আছে। কোন এক কাজে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, আমি মঠে নূতন যোগ দিয়াছি শুনিয়া উদ্বোধনের তদানীন্তন পূজারী আমাকে দয়া করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে লইয়া গেলেন। তখন সবে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার বিশেষ আড়ম্বর নাই। পূজারী নিজেই চন্দন ঘষিয়া, ফুল সাজাইয়া পূজায় বসিতেন। আমি শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের উত্তরের ছোট বারান্দায় বসিয়া একটু জপধ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম। কতক্ষণ এভাবে বসিয়াছিলাম মনে নাই। পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরের সামনে দিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে আসিয়াছিলাম, তখন খুব সম্ভব পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘর বন্ধ ছিল। ফিরিবার সময় দেখিলাম তাঁহার ঘর খোলা, বোধহয় জপধ্যানের পর তিনি চা খাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সভয়ে তাঁহার ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিলাম তিনি সস্নেহে ডাকিলেন, আমিও সঙ্কোচের সহিত তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। পূর্বে দুই-একবার তাঁহাকে বোধহয় মঠে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া সাহস করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে পারি নাই। এবার তাঁহার সস্নেহ আহ্বানে মনটি গলিয়া গেল। একেবারে তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনিও নানা কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল তিনি যেন আমার একান্ত আপন লোক।

মায়ের ঘরে গিয়া এতক্ষণ কি করিলাম, বসিয়া পূজাটুজা দেখিয়াছি না অন্য কিছু করিয়াছি, ইহাই তাঁহার প্রথম প্রশ্ন। উত্তরে একটু জপধ্যান করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলায় তিনি যেন খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং দীক্ষা লইয়াছি কিনা, কাহাকে ইষ্ট বলিয়া ধরিয়াছি, সাকার বা নিরাকার কোন্‌টি আমার ভাল লাগে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিলেন। দীক্ষা তখনও হয় নাই বলায় বলিলেন, "অবশ্য, ওতে দোষ নেই; তবে একটা ইষ্ট ঠিক না করিলে 'FRITTERING AWAY OF ENERGY' [বৃথা শক্তি ক্ষয়] হয়, দীক্ষা নিলে তা হয় না।' সাকার নিরাকারের প্রশ্নে শেষেরটিতে আমার বিশেষ আস্থা আছে বলায় বলিলেন, "তা ভাল, তবে সাকারও সত্য বলে জেনো। জানই তো, স্বামীজী যেমন বলতেন, একই সূর্যের বিভিন্ন স্তর হ'তে ফটো নিলে বিভিন্ন রকম ফটো ওঠে, তার কোনটিই কিন্তু মিথ্যা নয়। প্রত্যেকটিই সূর্যেরই ফটো।"

কথায় কথায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, শুনেছি যে একটি ছেলে সম্প্রতি মঠে এসেছে, সে নাকি ইতঃপূর্বে INTERNED হয়েছিল।" মাথা নীচু করিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ মহারাজ, সে আমিই।" মঠে প্রবেশ করিবার সময় উহা আমি কাহাকেও বলি নাই। শুনিয়াছিলাম উহা জানিতে পারিলে মঠ-কর্তৃপক্ষ আমাকে মঠে যোগ দিতে দিবেন না। কিন্তু আমার এক সহপাঠী আসিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। কি করিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের কানে উহা পৌঁছাইল, বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম; কিছু ভয়ও যে না হইয়াছিল, তাহা নয়। কিন্তু দেখিলাম মহারাজ উহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত বা বিচলিত না হইয়া কেন আমার ঐরূপ হইয়াছিল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমিও অকপটে সবই বলিলাম।

তিনি সেইদিন সাধন-ভজন সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বলিয়া-

ছিলেন যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত বলিয়া এখানে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া নীচে নামিলে কোন কোন সাধু উহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার তো দীক্ষা হ'য়েই গেল।" আমি কিন্তু উহা বুঝি নাই। তবুও এখন যখন সে কথা মনে পড়ে, মনে হয় হয়ত বা তিনিই আমার প্রথম দীক্ষাগুরু।

আর একদিনের কথা—কয়েক বৎসর পরে ঢাকা হইতে মঠে আসিয়াছি। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে দর্শন করিতে এক সন্ধ্যায় স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দের সহিত উদ্বোধনে আসিয়াছি। মহারাজ তাঁহার সেই ছোট ঘরটিতে [বৈঠকখানায়] বসিয়া আছেন; আশেপাশে সান্যাল মহাশয়, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ ও কয়েকটি ভক্ত—সকলেই চুপ করিয়া আছেন। হঠাৎ পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, "তোমাদের কার কি প্রশ্ন আছে কর।" আমাদের কোনই প্রশ্ন ছিল না, শুধু তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, তাই চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "তোদের কি কোন প্রশ্নই নেই, চুপ করে বসে আছিস্ কেন?" প্রশ্ন করিতে হইবে বলিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "মহারাজ, আপনারা ত এত সাধন-ভজন ক'রে, তাঁকে উপলব্ধি ক'রে, তবে কাজে নেমেছিলেন; তবে আমাদের মঠে যোগ দেবার সাথে সাথে কাজে নামাচ্ছেন কেন?" পূজনীয় শরৎ মহারাজ কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া কহিলেন, "তুই কি ভেবেছিস্ যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হবি [অর্থাৎ আগে সিদ্ধ হ'য়ে পরে কাজে নামবি], না স্বামী বিবেকানন্দ হবি? দেখ্, তোর বা আমার কারও ঐরূপ হওয়া হবে না, আমাদের জপধ্যান ও কাজ একসঙ্গে চালাতে হবে। এর কোনটি ছাড়লে চল্‌বে না।"

তাঁহার সহিত আর ঐরূপভাবে কোনও কথা হয় নাই, তবে ঐ দুদিনের স্মৃতি মনে জাগরূক রহিয়াছে।

স্বামী অভেদানন্দ

১৯২১-এর সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন সবে আমরা মঠে ঢুকিয়াছি; তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কথা তৎপূর্বেই প্রাচীন সাধুদের মুখে অনেক শুনিয়াছিলাম। তিনি স্বামীজীর আদেশে যে পাশ্চাত্যে গিয়াছিলেন ও সেখানে লণ্ডনে কিছুদিন প্রচারাদি করিবার পর আমেরিকায় New York-এ দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল প্রচারাদি করিয়া এখন ভারতে পৌঁছিয়াছেন ইহাও তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথাও তাঁহাদের মুখে অবগত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার ইচ্ছা আমাদের মনে স্বতঃই জাগ্রত হইয়াছিল।

সেপ্টেম্বরে তিনি মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। বেশ মনে পড়ে, সেইদিন মঠের কয়েকজন অভিজ্ঞ ও কর্মক্ষম সাধু তাঁহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া মঠে আনিবার জন্য কলিকাতা Prinsep ঘাটে গিয়াছিলেন, জাহাজটি রেঙ্গুন হইতে আসিতেছিল। সাধুগণ সেখানে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর শুনিলেন যে, তখনও জোয়ার না হওয়ায় জাহাজটির আসিতে অনেক দেরী হইবে ও খুব সম্ভব সওয়া তুইটার-আড়াইটার পূর্বে জাহাজ ঘাটে ভিড়াইতে পারিবে না।

সাধুগণ অগত্যা ওখানে অযথা বসিয়া না থাকিয়া মঠে ফিরিয়া আসাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন ও মঠে প্রসাদ পাইয়া সেখানে যথাসময়ে পৌঁছিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু হঠাৎ হাওয়া ও স্রোত অনুকূল হওয়ায় জাহাজটি প্রায় একটার মধ্যেই ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। পূজনীয় অভেদানন্দজী সেখানে মঠের কোন সাধুকে না দেখিয়া নিজেই একটি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া (তখন মোটর বা taxi

ছিল না) মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া অনেকেই অবাক্ হইলেন ও যাঁহারা তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে কাহাকেও কোন দোষ না দিয়া তাঁহার জিনিসগুলি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে বলিলেন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তখন মঠে ছিলেন না, পূজনীয় মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) সহিত দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তাঁহারই ঘরটি পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজের জন্য ইতঃপূর্বে গুছাইয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানেই তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল ও আমরা তাঁহার জিনিসগুলি সেখানে হাতে হাতে গুছাইয়া রাখিলাম।

আমি অতি অল্পদিন হইল সাধু হইয়াছি, তবুও তাঁহার সেবার ভার প্রথমে আমার উপরই ন্যস্ত হইল। আমার সহকারিরূপে মঠের স্বামী মনীষানন্দজী নিযুক্ত হইলেন। মহাপুরুষদের সেবা আমি ইতঃপূর্বে কখনও করি নাই, তাই আমার সেবায় নানারূপ ত্রুটি হইতে লাগিল। পূজনীয় মহারাজ কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র মনে না করিয়া আমাকে বলিলেন যে, "তোমার যখন সেবাজ্ঞান এইরূপ অল্প তখন মনীষানন্দকেই এইসব করতে দাও, তুমি ওর সহকারিরূপে থাক।" আমি সানন্দে উহাতে সম্মত হইয়া তদবধি মনীষানন্দের সহকারিরূপে তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলাম।

তখন হইতে ১৯২২-এ তাঁহার কাশ্মীর যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এইরূপে তাঁহার সান্নিধ্যলাভ ও সেবা করিবার যেটুকু সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল ও ঐ সময়ে তাঁহার যে সকল আচরণ মুখ্যত লক্ষ্য করিয়াছিলাম, যে সকল মূল্যবান বাক্য শুনিয়াছিলাম, তাহারই কিছু কিছু এখানে বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

তিনি পূর্বোক্ত ঘোড়ার গাড়ী হইতে যখন নামিলেন তখন আমরা

ভাবিয়াছিলাম যে তাঁহাকে কোট-প্যাণ্ট পরা সাধু হিসাবে দেখিব। কিন্তু দেখিলাম তিনি ভারতীয় সাধারণ সন্ন্যাসীদের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্রাদি পরিয়া আসিয়াছেন। উহা কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে, রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী শ্যামানন্দজী (তদানীন্তন মোহন্ত) উহা তাঁহারই আদেশে পূর্ব হইতে করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর তিনি মঠের (প্রাচীন) ঠাকুরঘরের দিকে তাকাইলেন। উহা শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিপ্রহরের ভোগের পর বহুক্ষণ হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সতৃষ্ণনয়নে সেইদিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে কি এখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার দর্শন করতে দেবে না?" তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া তদানীন্তন মঠের পূজক স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির খুলিয়া দিলেন। তিনিও মন্দিরের ভিতরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। জ্যোতির্ময়ানন্দজীও আমাদের বলিতে লাগিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তান এসেছেন, তিনি তাঁকে দর্শন করতে চাচ্ছেন, তখন কি আর মঠের সাধারণ আইন মানলে চ'লে? তাই অসময় হ'লেও তাঁর জন্য মন্দির খুলে দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর সাক্ষাৎ শরীরে থাকলে বহুদিন পরে বিদেশাগত তাঁর এই সন্তানকে দেখে কতই না আনন্দ করতেন!"

তিনি মন্দির হইতে ফিরিবার পর তাঁহার জন্য কিরূপ আহারের ব্যবস্থা করা হইবে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ তোমরা সকলে যেমন খাও, আমিও সেইরূপ খাবো।" এবং বাস্তবিকই পর পর ক'দিন তিনি সেইরূপ আহার করিলেন। কিন্তু তিনি বহুদিন ঐ দেশের (পাশ্চাত্যের) আহারে অভ্যস্ত। তাঁহার উহা সহিবে কেন? তাই কিছুদিন পরে উদরাময়ে আক্রান্ত হইলেন ও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উহা হইতে বিরত হইতে হইল।

অভেদানন্দজী মঠে পৌঁছিবার পরদিনই পূজনীয় শরৎ মহারাজ

[স্বামী সারদানন্দ] উদ্বোধন হইতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে মঠে আসিলেন। বহুদিন পরে উভয় ভ্রাতার সেই মিলন দেখিবার মত। দেখা হইবামাত্র পূজনীয় শরৎ মহারাজ—'এই যে সাহেব!' বলিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তিনিও তাঁহাকে কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার শরীরের দিকে তাকাইয়া "তোমার শরীর শেষে এইরূপ হ'য়ে গেছে, শরৎ," বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে দেশ-বিদেশের নানারূপ কথা বলিতে বলিতে তুই ভ্রাতা সেই দ্বি-প্রহরটি কাটাইয়া দিলেন। মনে হইল তুইটি সমবয়সী বালক যেন বহুদিন পরে পুনর্বার মিলিত হইয়াছে।

ইহারই কয়েকদিন পরে রাসবিহারী নামক মঠের পরিচিত একটি যুবক আসিয়া তাহার নিজ পরিচয় দিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি M.Sc. পড়ি, বর্তমানে কলকাতার Oxford Mission-এ আছি। সেখানকার পাদরীগণ আপনার রেঙ্গুনে প্রদত্ত যীশুখৃষ্ট বিষয়ক বক্তৃতা সম্বন্ধে নানারূপ বিরূপ সমালোচনা করছেন ও আপনার সহিত দেখা ক'রে এবিষয়ে আপনার যথার্থ কি বক্তব্য তা শুনতে চান।" শুনিয়াই পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, "বেশ তো, ঐ বিষয়ে আমাদের পরস্পর আলোচনা হ'বে।" কয়েকদিন পরে ঐ মিশনের অধ্যক্ষ সাহেবটিকে লইয়া রাসবিহারী উপস্থিত হইল।

পূজনীয় মহারাজ তখন দ্বিপ্রহরের আহার শেষ করিয়া বারান্দায় বসিয়াছিলেন। সাহেবটিকে দেখিয়া তাঁহার জন্য আর একটি চেয়ার আনিতে বলিলেন ও তিনি উহাতে উপবিষ্ট হইলে ঐ বক্তৃতার বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। যতদূর মনে পড়ে আলোচনা প্রথমে বেশ ভালভাবে আরম্ভ হইল। কিন্তু পরে উহা একটু তিক্ত আকার ধারণ করিল। সাহেবটি বার বার বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম অর্থাৎ Christianity-কে

আঘাত করা হইয়াছে। তদুত্তরে মহারাজ বলিতেছিলেনঃ "আমি ত Christianity-কে আঘাত করিনি, তোমাদের Christianity-কে অর্থাৎ যেভাবে তোমরা বাইবেলকে ব্যাখ্যা কর, তাকেই আঘাত ক'রেছি। তোমরা বাইবেলকে যথাযথ ব্যাখ্যা কর না কেন? করলে সকলের উপকার হ'ত।" সাহেব ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন ও বেদাদিরও হিন্দুরা যে অপব্যাখ্যা করেন তাহা বলিতে লাগিলেন ও ঐ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য আর একদিন সংস্কৃতে বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁহার এক বন্ধুকেও লইয়া আসিবেন বলিলেন। মহারাজ ইহাতে সম্মত হইলেন, নির্দিষ্ট দিনে সাহেবটি তাঁহার বন্ধুকে লইয়া আসিলেন ও তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া প্রথমেই বলিলেন, "ইনি আমাদেরই একজন পাদরী, Oxford University হইতে সংস্কৃতে M. A. পাশ করিয়াছেন ও পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বেদাদিতে ইনি বিশেষ পারদর্শী, শুধু পারদর্শী নহেন—উহার Authority (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ)"—অর্থাৎ তিনি যেরূপ বেদ ব্যাখ্যা করেন তাহাই সত্য বলিয়া সকলে গ্রহণ করেন। 'He is an authority in the Vedas'—ইহা শুনিয়াই মহারাজ গর্জন করিয়া উঠিলেনঃ "Authority, Authority in the Vedas?" (অধিকারী? বেদের অধিকারী?) কে এই ব্যক্তি? সাহেব পুনরায় তাঁহাকে দেখাইয়া ঐ কথারই আবৃত্তি করিলেন। এইবার সমধিক গর্জনে মহারাজ বলিলেন, "No, he cannot be the authority" (না, ইনি কখনই বেদের অধিকারী নহেন) অর্থাৎ ইঁহার ব্যাখ্যা কখনই বেদের প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিব না। সাহেবটি ততোধিক উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "Then, who is the authority?" (তাহা হইলে উহার অধিকারী কে?) মহারাজ নিজের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "We are the authorities (আমরাই অধিকারী), তোমরা নও। (অর্থাৎ বেদের মর্ম জানিতে হইলে আমাদের নিকট আসিতে হইবে)।

দুই-একখানি বই পড়িয়া উহার মর্ম গ্রহণ করা যাইবে না।" বলা-বাহুল্য, সাহেবদ্বয় ক্ষুণ্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পরে মহারাজ আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এইসকল সাহেব দেখে ভয় পাও। ওরা কতটুকু জানে? ঐ দেশে ওদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক James, Royce প্রভৃতির সহিত আমার কত সভায় কত রকম আলাপ ও আলোচনা হ'য়ে গেছে। আমাদের দার্শনিক তত্ত্ব শুনে তাঁরা অনেক সময় তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।" এইরূপ একটি ভোজ-সভার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "খেতে গেছি কিন্তু সেখানে দেখি James (William James) প্রমুখ দার্শনিক রয়েছেন। এক-আধ কথা আলাপের পর James তাঁর Plurality of Universe (বিশ্বের বহুত্ব) বিষয়ক গবেষণা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলেন। তখন বুঝলাম ওটি শোনাবার জন্যই আমাকে এই ভোজসভায় ডাকা হয়েছে। উহা শেষ হ'লে যিনি ঐ সভা ডেকেছেন তিনি আমাকে বললেন, "স্বামীজী, এ বিষয়ে আপনার কিছু বলবার আছে কি?" আমরা চিরদিনের অদ্বৈতবাদী সুতরাং তাঁর ঐ ব্যাখ্যা মানবো কেন? আমি দাঁড়িয়ে একে একে তাঁর গবেষণার সকল points (বিষয়গুলি) খণ্ডন করলাম ও এক অদ্বিতীয় বস্তু হ'তে যে জগতের সমস্ত বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে ও সেই অদ্বয় বস্তুই যে সকলের উপরে বিরাজমান তা প্রমাণ করলাম। James উহার সকল বিষয়গুলি মেনে নিলেন কিনা জানি না, কিন্তু উহা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হ'য়েছেন বুঝলাম।"

* * *

ধীরে ধীরে অনেক সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ্‌গণ মঠে আসিয়া পূজনীয় মহারাজের সহিত দেখা করিতে লাগিলেন এবং এদেশ ও ঐ-দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিক্ষা-পদ্ধতির বিষয় তাঁহার সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিলেন। শীঘ্রই কলিকাতায়

তাঁহার পাশ্চাত্যে প্রচারের সফলতার জন্য একটি মহতী সভার আয়োজন করিয়া অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা হইল। তখন তাঁহাকে সকলেই চেনে কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁহার যে বালকোচিত সারল্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা এখানে একটু উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

মঠের নিকটেই কলিকাতার দাঁ-এদের বিখ্যাত রাসবাড়ী। সেখানে প্রতি বৎসর রাসের সময় মেলা বসে। দেব-দেবীর নানারূপ পুতুলের সহিত সাধারণের মনোরঞ্জনকারী পুতুলগুলিও সাজাইয়া দেওয়া হয়, নানারূপ খেলনা ও দেশী খাবারেরও সেখানে আয়োজন হয়। কয়েকদিন ধরিয়া এই মেলা চলিতে থাকে। উহারই একদিনে মহারাজ বলিলেন: "চল, রাসবাড়ীতে মেলা হচ্ছে আমরা একদিন দেখে আসি, বহুদিন দেখিনি (১৯০৬-এর পর এই তাঁহার প্রথম প্রত্যাবর্তন)।" ওখানে নানারূপ লোক আসে, বহু ভীড়, ইত্যাদি বলিয়াও তাঁহাকে কিন্তু নিরস্ত করা গেল না। এক দিন বৈকালে তিনি আমাদিগকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ও সাধারণ দর্শকের মত সকল পুতুল ও খেলনাদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন: "ওহে! শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, এসব স্থানে এসে কিছু কিনতে হয়, নতুবা গরীব মানুষ, যারা অনেক আশা ক'রে তাদের জিনিসগুলি বিক্রি করতে এখানে এসেছে, তারা খালি হাতে বাড়ী ফিরে যাবে। দেখ কি আছে!" আমরা ছুরি বা ঐ জাতীয় কিছু কিনিয়া আনিলাম। উহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন: "কি খাবার আছে—দেখ।" খাবারগুলি বাসি, ভাল নহে ইত্যাদি বলিয়া, তখনকার মত তাঁহাকে নিরস্ত করা হইল, কিন্তু কিছু পরেই চিনাবাদাম বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া বলিলেন: "উহাই কেন না কেন?" আমরা তাঁহার আদেশে উহার তিনটি প্যাকেট কিনিয়া আনিলাম। তিনি দুটি প্যাকেট আমাদিগকে দিয়া একটি প্যাকেট নিজে লইয়া সেই

মেলাস্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই উহা খাইতে লাগিলেন। তিনি যে পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় বেদান্তাদি প্রচার করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তিনি যে বর্ষীয়ান সাধু—তখন তাঁহার বয়স ৫৫-এর মত, তাঁহাকে দেশে-বিদেশে যে অনেকেই চেনে—একথা যেন তিনি তখন একেবারে ভুলিয়া গেলেন। মনে হইল ঠাকুরের কথা স্মরণ করিতে করিতে তখন যেন তিনি আবার বালক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার অন্য সকল সত্তা লোপ হইয়া গিয়াছে।

ইহারই এক সময়ে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যেঃ "দেখ, ওদেশে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করত, আপনার বয়স কত? আমি বলতাম তিরিশ-বত্রিশ হবে। তখন তারা অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। পরে আমি তাদের বুঝিয়ে বলতাম যে, আমার বয়স অর্থ আমি যেদিন মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হয়েছি তা নয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম আলাপ হ'য়েছিল ও তিনি আমাকে তাঁর আপনজন বলে টেনে নিয়েছিলেন সেই দিন থেকেই অর্থাৎ ১৮৮৩।৮৪ সন থেকেই তা ধরতে হবে।"

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আবার কেউ কেউ ওদেশে আমাকে জিজ্ঞেস করত আপনি কি ভগবান দর্শন করেছেন? আমি বলতামঃ 'নিশ্চয়ই'।" আমরা তাঁহার এই কথা শুনিয়া কিছু সন্দিগ্ধভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলামঃ "সত্যিই কি মহারাজ আপনি ভগবান দর্শন করেছেন?" শুনিয়াই তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেনঃ "নিশ্চয়ই! শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেছি, ভগবান দর্শনের আর কি বাকী আছে বল।"

তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর এইরূপ অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়া আমরা সত্য-সত্যই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতাম, ও ভাবিতাম কবে আমরাও এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আপন বলিয়া বুঝিতে পারিব।

[২]

বেলুড় মঠে কিছুদিন থাকিবার পর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের শরীরটি একটু খারাপ হইয়া পড়ে। উহা সারিবার জন্যই হউক বা কলিকাতার অধিবাসী ও প্রাচীন ভক্তগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার জন্যই হউক তিনি কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসেন ও সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত বলরামবাবুর বাড়িতে উঠেন, সঙ্গে সেবক হিসাবে আমাদেরও আসিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার যেরূপ অমায়িক ব্যবহারাদি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহাই লিখিতেছি।

এইখানে কয়েকদিন থাকিবার পর তিনি হঠাৎ পেটের অসুখে আক্রান্ত হন। পূজ্যপাদ ধীরানন্দ স্বামী [কৃষ্ণলাল মহারাজ] তখন বলরামবাবুর বাড়িতে তাঁহাদের একরূপ অভিভাবকের মত থাকিতেন। মহারাজের এইরূপ অসুখের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, নিকটেই ডাক্তার বিপিনবাবু [ঘোষ] থাকেন, যদি অনুমতি করেন তো তাঁহাকে এইজন্য খবর দেওয়া যাইতে পারে। বিপিনবাবু মহারাজদের সহিত পূর্ব হইতে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের পূর্বাশ্রমের নিকট আত্মীয়, ও তাঁহাদের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বহুবার গিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়াই মহারাজ তাঁহাকে আনিতে বলিলেন ও ইহার জন্য আমাকে তাঁহার কম্বলীটোলার বাড়িতে পাঠাইলেন। পূজ্যপাদ মহারাজের অসুখের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার কার্যাদি সারিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আমরা একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম, যাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণের পক্ষেই সম্ভব। আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছি, কিন্তু ডাক্তার আসিবামাত্র তিনি "এই যে ডাক্তার" বলিয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন ও তখন হইতে পনের-বিশ মিনিট পর্যন্ত শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও তৎপরে ওদেশে তাঁহার নানা অভিজ্ঞতার কথা লইয়াই পরস্পর আলোচনা করিতে

লাগিলেন। আমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, প্রায় আধঘণ্টা পরে ডাক্তার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই যেন জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তা ভাই আমাকে কেন ডাকলে?" তখন তাঁহার যেন দেহের কথা মনে আসিল ও বলিলেনঃ "হ্যাঁ, ডাক্তার, কাল রাত্রি হ'তে কয়েকবার পায়খানা হয়েছে, তাই তোমাকে ডেকেছি।" ডাক্তারও একটি **Prescription** [ব্যবস্থাপত্র] লিখিয়া আমাদিগকে ঔষধ আনিতে বলিলেন। **Prescription**-টি দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "ডাক্তার, তোমার ওষুধের ওপর কিরূপ বিশ্বাস?" ডাক্তারও তখন তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া বলিলেন, "ভাই, তা যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলবো,—সত্য কথা বলতে কি ওষুধের প্রতি আমার কোন বিশ্বাস নেই; একই ওষুধ দেখ্‌ছি বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর বিভিন্নরূপ কাজ করে, কেউ বা সেরে ওঠে, কারও বা কিছুই হয় না!" শুনিয়া বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ বলিলেন, "হাঁ, ডাক্তার, ওদেশের বিচক্ষণ ডাক্তারের নিকটেও এইরূপই শুনেছি।"

এইখানে থাকিতে থাকিতে, মনে পড়ে, দানিবাবু [স্থরেন ঘোষ প্রসিদ্ধ নাট্যকার ভক্তবীর গিরিশবাবুর পুত্র] তাঁহাকে একদিন নাট্যশালায় তাঁহাদের অভিনয় দেখিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভক্তপ্রবর গিরিশবাবুর সহিত দানিবাবুকে তিনি বহুবার দেখিয়াছেন, স্থতরাং তাঁহার অনুরোধে রাজী হইলেন ও আমাদিগকে লইয়া একরাত্রে 'মিনার্ভায়' [দানিবাবু তখন সেইখানেই থাকেন] অভিনয় দেখিতে গেলেন। অতি যত্নসহকারে একটি Box-এ মহারাজের সহিত আমাদিগকেও বসান হইল। বেশ মনে পড়ে, সেইদিন গিরিশবাবুর রচিত সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' অভিনীত হইতেছিল। দানিবাবু উহার শ্রেষ্ঠ অংশ যোগেশের পার্ট অভিনয় করিতেছিলেন। সরল উদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশ কি করিয়া তাঁহার উদারতা ও সরল ব্যবহারের জন্য ক্রুর ব্যবহারজীবী তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতার দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন ও কি করিয়া সর্বস্ব হারাইয়া তিনি

তাঁহার গভীর দুঃখ দূর করিবার জন্য মদ্যপানে আসক্ত হন ও অবশেষে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ইহাই যোগেশের অভিনয়ের বিশেষ অংশ ছিল। দানিবাবু অতি নিখুঁতভাবে এই পার্টটি করিতেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক মূর্তিতে তাঁহার যোগেশের অভিনয় দেখিয়া আমরা খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজের নিকট উহার দোষগুণ সবই ধরা পড়িল। কয়েক ঘণ্টা থাকিবার পর রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ স্বস্থানে ফিরিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন ও জনৈক অভিনেতাকে দানিবাবুকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। দানিবাবু আসিলেন ও মহারাজকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অভিনয়টি কেমন লাগিল। তদুত্তরে মহারাজ শুধু বলিলেনঃ "তোমার বাবার অভিনয় তো আমরা দেখেছি।" দানিবাবু ইহার অর্থ বুঝিলেন ও তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা! তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত ও আমি একটা মহা মূর্খ। তবুও আপনাদের আশীর্বাদ পাচ্ছি এই-ই আমার মহা সৌভাগ্য।" তারপর কথায় কথায় তাঁহার গলা হইতে একটি উপবীত বাহির করিয়া বলিলেন, "আমার শঙ্করাচার্য অভিনয় দেখে শ্রীশ্রীমহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আমাকে এটি উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি উপবীত ধারণের উপযুক্ত'।"

যথাসময়ে আমরা বলরাম মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম, অপর একদিন অপরেশবাবুর [মুখোপাধ্যায়] আগ্রহে মহারাজসহ আমরা [তিনি বিদেশে এইরূপ বহু অভিনয় দেখিয়া আসিলেও] 'ষ্টার' থিয়েটারে 'সাজাহান' অভিনয় দেখিয়াছিলাম। দেশের এইসকল অভিনেতা ও নাট্যকারদের উৎসাহ দিবার জন্যই মহারাজ যেন উহাদের এইসকল অভিনয় দেখিতে যাইতেন। কথাচ্ছলে আর একদিন অপরেশবাবুকে বলিয়াছিলেন, "আপনারা original [মৌলিক] হোন, তা হ'লে ও দেশেও [পাশ্চাত্যেও] আপনাদের আদর হবে। ওরা **originality** চায়, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে

অত শ্রদ্ধা করে। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন original—একেবারে মৌলিক, তাই তাঁকে ওদের অত ভাল লাগে।"

ইহার কিছুদিন পরে জামসেদপুর হইতে কয়েকটি যুবক ভক্ত আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তাঁহারা সেখানে Vivekananda Society নাম দিয়া একটি ছোট সঙ্ঘ গড়িয়াছেন, দরিদ্র আর্ত নারায়ণদের সেবাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সেখানে তিনি গেলে তাঁহাদের সঙ্ঘ প্রাণবন্ত হইবে। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহাদের কথাবার্তা ও উদ্দেশ্যাদির কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যাইতে রাজী হইলেন।

কিছুদিন পরে ভক্তেরা আসিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন। আমরাও সেবক হিসাবে তাঁহার সহিত গিয়াছিলাম। ভক্তেরা রাজোচিত সম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। একটি প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইল, উহাতে তাঁহারা জানাইলেন, "জামসেদপুর একটি Cosmopolitan Town, শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নয়—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বিচক্ষণ অভিজ্ঞ কর্মীরা আসিয়া সেখানে নানারূপ কর্মে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু সকলেই জড়ের উপাসক। ইহার এই Constant Din and Bustle [এই সর্বদা হৈ-চৈ]-এর ভিতর আমাদের উচ্চ চিন্তা করিবার অবসর নাই, আপনার এই শুভ সংক্ষিপ্ত আগমনে, আশা করি, আমাদের হৃদয় উন্নত হইবে ও কর্মকে উপাসনারূপে আমরা দেখিতে পাইব এবং যে সকল বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় এখানে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের ভিতরে সৌহার্দ্য-বন্ধন দৃঢ় হইবে।"

ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ মহারাজ একটি সুন্দর সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন; তাহাতে বলিলেন, "ধর্ম প্রত্যক্ষ বস্তু, ওটি কথার কথা নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে আমরা এর গূঢ় মর্ম বুঝতে পেরেছি। তিনি অহরহ ভগবদ্‌ভাবে অভিভূত থাকতেন। তাঁর নিকট জাতি, ধর্ম বা

কালের কোনও বিশেষত্ব ছিল না। বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই তাঁর নিকট আসতেন ও তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁর ভিতরে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন। তিনি সকল ধর্মের যেন মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীভগবানকে তিনি শুধু নিজের ভিতরেই দেখতেন না—সর্বভূতে তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষ করতেন। যাদের আমরা অতি ঘৃণা করি, তাদের ভিতরেও তিনি তাঁর পূর্ণ-সত্তা অনুভব করতেন। শুচি-অশুচি, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের কোন পার্থক্যই তিনি দেখতে পেতেন না। সব অবজ্ঞাত লাঞ্ছিতদের শিবজ্ঞানে সেবা করলে নিজেদের চিত্তশুদ্ধি হয়। শুদ্ধচিত্তে শ্রীশ্রীভগবান আপনিই আবির্ভূত হন। সকল ধর্মেই একথা বলে। আপনারাও যদি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ঐরূপ একটি কেন্দ্র এখানে খুলে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে পারেন তবে আপনাদেরও চিত্ত শুদ্ধ হবে ও তারই মাধ্যমে আপনারা শ্রীশ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করবেন।"

ঐরূপ আরও ৩।৪টি বক্তৃতা তিনি সেখানে দিয়াছিলেন। পরে ঐগুলি 'Lectures of Swami Abhedananda at Jamshedpur' নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার বক্তৃতার ফলস্বরূপ অচিরে সেখানে একটি রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী শাখা স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে নানাভাবে সেবাদি করিয়া জনগণের হৃদয়ে কর্মযোগের বীজ উপ্ত হইতেছে।

ভক্তগণের আগ্রহে পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদের লইয়া একদিন উঁহাদের ইস্পাতের কারখানা 'Tata Iron and Steel Works' দেখিতে গিয়াছিলেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহার সকল বিভাগ ঘুরিয়া দেখিয়াছিলেন। এইরূপ কারখানা ভারতের মধ্যে প্রথম ও সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু ঐ দেশে [পাশ্চাত্যে] ঐ জাতীয় কারখানা অনেক আছে। তাই ফিরিয়া আসিয়া আমরা

উহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "সত্যই এটি Jamshedji Tata-র অদ্ভুত কীর্তি কিন্তু ওদেশে [New York-এ] আমি যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান দেখেছি তাতে এমনি আটটি বা তার বেশী কারখানা এক সঙ্গে থাকতে পারে।"

অন্য একদিন তিনি উহার General Manager [তখন একজন American]-এর সহিত আলাপ করেন। সাধু হইলেও শিল্পাদি সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত ও অতি আধুনিক জ্ঞান দেখিয়া তিনিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

জামসেদপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজের আর অধিক দিন সেবা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যে কয়দিন সেবা করিয়াছি ও তাঁহার জীবনের যেটুকু বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহাদের আশীর্বাদে আমাদের সকলের চৈতন্য হউক প্রার্থনা করি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

শ্রীমদ্ভাগবতে পরম ভক্ত উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥

—ভাগবত, ১১।১৮।২৯

—মহাপণ্ডিত হইয়াও তিনি বালকের ন্যায় ক্রীড়া করেন। সর্ববিষয়ে কুশলী হইয়াও জড়ের মত বসিয়া থাকেন। তাঁহার অসংলগ্ন বাক্য শুনিয়া লোকে তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করে। বেদনিষ্ঠ হইয়াও তিনি অনিয়ত আচরণ করেন।

ইহা অবশ্য বিবিদিষু—তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে। যাঁহারা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ব হইতেই জ্ঞানলাভ করিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—শুধু তাঁহাদের পক্ষেই প্রযোজ্য।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর পূত চরিত্রে আমরা উপরোক্ত কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি সত্যই মহাপণ্ডিত হইয়াও বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সর্বকর্মে পারদর্শী হইয়াও অনেক সময় জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার একরূপ অসংলগ্ন বাক্যের অর্থ অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারিতাম না। তিনি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন অথচ বাহ্য আচরণ হইতে তাহার কিছুই বুঝা যাইত না।

তাঁহার সেবকগণ বলেন যে, তাঁহার অদ্ভুত পোশাক দেখিয়া অনেক সময় এলাহাবাদের রাস্তায় ছেলেরা তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। উহা দেখিয়া তিনি কৌতুকভরে তাহাদিগকে বলিতেন—"ক্যা দেখ্‌তা হ্যায়্—বান্দর? হাঁ—এ তো বান্দরই হ্যায়্—রামজীকা বান্দর!"

আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার খাটে সব সময়ই বিছানা পাতা থাকিত। উহাতে ধূলা-বালি পড়িলেও তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কাহারও উহা স্পর্শ করিবার উপায় ছিল না। একবার আমাদেরই একটি সাধু কয়েক দিনের জন্য তাঁহার সঙ্গলাভের আশায় এলাহাবাদে যান ও তাঁহার বিছানার অবস্থা দেখিয়া, মহারাজের অনুপস্থিতিতে, উহা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঠিক করেন। মহারাজ বাহির হইতে ফিরিয়া বিছানার ঐরূপ সংস্কৃত অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সাধুটিকে ডাকিয়া পাঠান ও তাঁহাকে সময়-সারিকা (**Time-table**) দেখাইয়া বলেন—"দেখুন, আপনার ট্রেন আজ অমুক সময়, ঐ ট্রেনেই আপনাকে ফিরে যেতে হবে।" সাধুটির অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তাঁহার ঐ আদেশই বহাল রহিল।

তাঁহার ঐ খাটেরই একটু উপরে একটি কুলুঙ্গিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি থাকিত। উহাতেও তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কাহারও হাত দিবার উপায় ছিল না।

গ্রীষ্মকালে তাঁহার জন্য তিনটি বিছানা করিতে হইত। একটি উঠানে, একটি বারান্দায় ও একটি তাঁহার ঘরে। তিনি প্রথমে উঠানেরটিতে আসিয়া শুইতেন। ঝড়-বৃষ্টি আসিলে বারান্দারটিতে আসিতেন; ঝড়-বৃষ্টি আরও বাড়িলে ঘরেরটিতে শুইতেন। তিনটিতেই কিন্তু মশারি আদি খাটান থাকিত এবং বৃষ্টিতে ভিজিতে থাকিলেও তখন তাহা কাহারও উঠাইবার অনুমতি ছিল না।

তিনি সর্বদা একাকী থাকিতেই ভালবাসিতেন। বাহিরের কেহ এমন কি আমাদের সাধুরাও ২।১ দিনের জন্য আশ্রমে আসিলে ২।১ দিন বাদে সময়-সারিকা দেখাইয়া আশ্রমত্যাগের নির্দেশ দিতেন।

অসুখ হইলেও তিনি কোনও ঔষধ খাইতে চাহিতেন না ও তাঁহার ঐ অসুখের বিষয় কেহ মঠে জানাইলে মহা বিরক্ত হইতেন ও সেই সেবকের উপরেও তৎক্ষণাৎ আশ্রম পরিত্যাগের আদেশ হইত।

এইরূপই ছিল তাঁহার অনন্যসাধারণ অত্যদ্ভুত আচরণ।

আমরা তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। তখন তিনি স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের জন্য বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। উহার কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর মন্দিরের পূজাদির ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তখন শুধু স্বামীজীর মন্দিরের নীচের অংশটুকু (যেখানে স্বামীজীর প্রতিমূর্তি রহিয়াছে) ও উহার চারিদিকের আবরণশূন্য বারান্দামাত্রই ছিল। নিকটে তখন অন্য কোনও মন্দিরাদি ছিল না। মঠ বাড়ির অংশ ছাড়া তাহার দক্ষিণ দিকে, স্বামীজীর মন্দিরের দিকেও, কোন পোস্তা বাঁধান হয় নাই। জোয়ারে গঙ্গার জল প্রায় স্বামীজীর মন্দিরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িত। নির্জন স্থান বলিয়া অধিকাংশ সময় আমরা ওই স্থানে ধ্যান-জপাদিতে কাটাইতাম। অতি অল্প লোকই তখন সেদিকে আসিতেন। ঐ মন্দিরের চারিদিকে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কিছু ইষ্টকাদি পড়িয়াছিল। একদিন একটি বিদেশাগত ভদ্রলোক (সাহেব) আসিয়া আমাদের দেখিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা বিবেকানন্দের মন্দিরটি এরূপ অযত্নে ফেলে রেখেছো কেন? আমরা তাঁকে কত শ্রদ্ধা করি, জানো?......" ইত্যাদি। আমরা তখন তাঁহার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারি নাই। পরে মহাপুরুষ মহারাজকে উহা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "কেন, ওটি Under Construction [নির্মাণাধীন] বললে না কেন?" সে সময় আমরা মঠের অফিসেও কিছু কিছু কাজ করিতাম। জনৈক ব্রহ্মচারী তাহা পরিচালনা করিতেন। তাঁহার নিকট উহা বলিলে তিনি বলিলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ ঠিকই বলেছেন। এই মন্দিরের ওপর শীঘ্রই একটি দোতলা মন্দির হবে। তার নকশাটিও ঠিক হয়েছে এবং এর জন্য অর্থাদিও এসেছে। কিন্তু তা করবার ভার বিজ্ঞান মহারাজের ওপর। তিনি এলাহাবাদে থাকেন—একটু খামখেয়ালী লোক। তাই কবে এসে যে কাজ আরম্ভ করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি।"

এই প্রসঙ্গে তিনি পূজ্যপাদ মহারাজজীর সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের বলিতে লাগিলেন ঃ

"আগে বিজ্ঞান মহারাজ উত্তর প্রদেশের Executive Engineer ছিলেন এবং স্বামীজী থাকতেই ঐ গৌরবের পদ ছেড়ে দিয়ে আলমবাজার মঠে যোগ দেন ও স্বামীজীর আদেশ নিয়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে নিজেই বিদ্বৎ-সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তারপর বেলুড় মঠের জমি হ'লে স্বামীজীর আদেশে তিনি ঐ জমির উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর ও সাধুদের থাকবার স্থানটিও উহার দোতলায় স্বামীজীর থাকবার ঘরও নির্মাণ করেন। গঙ্গার পোস্তা ও সিঁড়ি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত হয়। তিনি খুবই পণ্ডিত, 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থটি তিনি অনুবাদ করেছেন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আরও কিছু কিছু বই লিখেছেন।"

উক্ত ব্রহ্মচারীটি এই প্রসঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত পোশাক ও আচরণ সম্বন্ধেও কিছু কথা আমাদিগকে শুনাইলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার যে সকল দিব্য দর্শনাদি হইয়াছে তাহাও অল্প-বিস্তর বলিলেন। সেজন্য আমরা বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার দর্শনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

মনে হয়, তখন ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। দেখিলাম একটি ছ্যাকড়া গাড়ি করিয়া তিনি হঠাৎ মঠের সামনের মাঠে আসিয়া নামিলেন। তাঁহার এই আসার বিষয়ে পূর্বে কাহাকেও খবর দিয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু তিনি একাকী গাড়ি হইতে অবতরণ করাতে মনে হইল যে, পূর্বে তাঁহার আসার সংবাদ মঠে আসে নাই। প্রথমেই তাঁহার অদ্ভুত পোশাকের উপর আমাদের দৃষ্টি পড়িল। বাস্তবিকই উহা অদ্ভুত। তাঁহার মাথায় একটি গরম কাপড়ের কান ঢাকা টুপি, গায়ে একটি লম্বা গরম কোট—যাহা প্রায় হাঁটু অবধি নামিয়াছে এবং তাহার দুইদিকে বৃহদাকার কতগুলি পকেট—যাহার মধ্যে বহু জিনিস একত্রে রাখা চলে; পরনে একটি ছোট পাঁচ হাত ধুতি, পায়ে দুই জোড়া মোজা এবং চটি

জুতা। এই বেশেই তিনি গাড়ি হইতে নামিলেন। নামিয়াই কিন্তু তিনি সোজা স্বামীজীর মন্দির অভিমুখে গেলেন ও নিকটবর্তী যাঁহাদের দেখিতে পাইলেন (তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় স্বামী শঙ্করানন্দজীও ছিলেন) তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বামীজীর মন্দিরের জন্য কি কি মাল-মসলা যোগাড় করা হইয়াছে। উহা সবিশেষ শুনিয়া তিনি মঠবাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার জন্য পূর্ব হইতেই স্বামীজীর ঘরের পাশের ছোট ঘরটি—যাহা আমরা 'খোকা মহারাজের ঘর' বলিয়া জানিতাম—নির্দিষ্ট ছিল। তিনি সেখানে উঠিলেন। ব্রহ্মচারী বুদ্ধচৈতন্য (বর্তমানে স্বামী ভাস্বরানন্দ) তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। আহার ও বিশ্রামাদি করিবার পর তিনি আবার স্বামী শঙ্করানন্দজী প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর মন্দির সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন।

অতি শীঘ্রই মাল-মসলা সব যোগাড় হইল এবং তিনিও নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশেরও ঊর্ধ্বে, দেহও খুবই স্থূল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিতে দেখিয়াছি। সকালে চা ও তৎসঙ্গে সামান্য কিছু খাইয়া, কুলি-মজুরেরা কাজে আসিবামাত্রই—বেলা ৮টায় তিনি কার্যস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং বেলা ১টা পর্যন্ত, যতক্ষণ মিস্ত্রী ও কুলিরা কাজ করিত ততক্ষণ, নিকটবর্তী দেবদারু বৃক্ষতলে কখনও বা দাঁড়াইয়া, কখনও বা বেঞ্চিতে বসিয়া সকল কার্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিতেন। ১টায় সকলের কাজ শেষ হইলে তিনি আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া (স্নান তিনি অতি অল্পই করিতেন) দুপুরের আহারাদি শেষ করিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করিতেন। আবার ২টা হইতে কাজ আরম্ভ হইলেই তিনি বিশ্রাম হইতে উঠিয়া সেখানে যাইতেন। তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সেও ঐরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আমরা নিজেদের দিকে তাকাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইতাম।

আমাদের বন্ধুবর স্বামী ভাস্বরানন্দের নিকট শুনিয়াছি, ঐ সময় তাঁহার আহার অতি সাধারণই ছিল। সকালে কয়েক কাপ অতি অল্প দুগ্ধমিশ্রিত চা ও প্রসাদী দু-একটি সন্দেশ খাইয়াই তিনি তাঁহার কাজে যোগ দিতে যাইতেন। দ্বিপ্রহরে কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া বা সামান্য স্নান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ প্রসাদাদি পাইতেন। বৈকালেও ঐরূপ চা এবং রাত্রেও অনুরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) ভুবনেশ্বর মঠ হইতে বেলুড় মঠে আসিলেন। আসিয়াই তিনি সর্বপ্রথমে বিজ্ঞান মহারাজের আহারের আরও কিছু সুব্যবস্থা করিলেন ও তিনি যাহা যাহা খাইতে ভালবাসেন তাহা বাজার হইতে আনাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার আহারাদি কিরূপ হইল মাঝে মাঝে তাহারও খবর লইতেন। বিজ্ঞান মহারাজও ছোট শিশুটির ন্যায় তাঁহাকে নিজ আহারাদি বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া বলিতেন। এই সময় তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাদি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ ঐ সময় অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া গঙ্গার দিকের উপরের বারান্দাটিতে তাঁহার আরামকেদারায় ভাবস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। আমরা সাধু-ব্রহ্মচারিগণ একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ আসনে বসিয়া ধ্যান-জপাদি করিতাম। তাঁহার গুরুভ্রাতাগণও তাঁহাদের ধ্যান-জপাদি সারিয়া "সুপ্রভাত, সুপ্রভাত" বলিয়া প্রায় সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতেন। কেবল মহাপুরুষ মহারাজ, তাঁহার অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, করজোড়ে শুধু "মহারাজ, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত" বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অভিবাদন

করিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজও স্মিতহাস্তে তাঁহাদের সকলকে "সুপ্রভাত" ও মহাপুরুষ মহারাজকে "তারকদা, সুপ্রভাত" বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজকে দেখিতাম, তিনি শুধু "সুপ্রভাত" বলিয়াই বা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, রোজই সকাল সন্ধ্যায় আমাদের সকলের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া তবেই নিজ কর্মে যোগ দিতে যাইতেন। শ্রীশ্রীমহারাজকে ঐ সময় বলিতে শুনিয়াছিঃ "পেসন (হরিপ্রসন্ন মহারাজ বা বিজ্ঞান মহারাজ)-এর ভক্তি শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) ভক্তির পরেই।"

নিত্যই সান্ধ্য আরাত্রিকের পরে আমরা পুনরায় শ্রীশ্রীমহারাজের সম্মুখে মিলিত হইতাম। মঠে উপস্থিত শ্রীশ্রীমহারাজের সকল গুরুভ্রাতাগণ ও মঠের অন্যান্য প্রাচীন সাধুবৃন্দও সেখানে আমাদের সহিত মিলিত হইতেন। কোন কোনদিন শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের বলিতেনঃ

"তোরা শুধু চুপ করে বসে আছিস কেন? কিছু প্রশ্ন কর। পেসনকেই প্রশ্ন কর। তোরা জানিসনে, পেসন গুপ্তযোগী। ওই তোদের প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবে।"

আমরা প্রায় কেহই কোনরূপ প্রশ্ন করিতে পারিতাম না। তখন শ্রীশ্রীমহারাজই আমাদের হইয়া বিজ্ঞান মহারাজকে এক-একটি প্রশ্ন করিতেন এবং তিনিও একেবারে অনভিজ্ঞ বালকের মত হাতজোড় করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিতেনঃ "মহারাজ আমি কি জানি? আমি কি জানি? আপনিই ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিন।"

অবশ্য মহারাজ ইহাতেও ছাড়িতেন না। অবশেষে বিজ্ঞান মহারাজকে কিছু উত্তর দিতে হইত। এইরূপে অতি কুশলী হইয়াও তাঁহাকে বালকের ন্যায় আচরণ করিতে দেখিতাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ রোজই তাঁহার কাজের (স্বামীজীর মন্দিরের কাজের) খবর লইতেন এবং মাঝে মাঝে তাহাতে কোনও ত্রুটি হইলে তাহাও

দেখাইয়া দিতেন। বিজ্ঞান মহারাজও উহা অতি সম্ভ্রমের সহিত মানিয়া লইতেন এবং মাঝে মাঝে আমাদের সম্মুখেই শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিতেনঃ "মহারাজ, আপনি এইসব কি করে জানলেন?" মহারাজও ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিতেনঃ "পেসন, গুরুকৃপাসে সব আপসে আ যাতা হ্যায়!" বিজ্ঞান মহারাজ ভূতপূর্ব উচ্চপদস্থ সরকারী ইঞ্জিনিয়ার হইয়াও উহা নতমস্তকে মানিয়া লইতেন।

একদিনের ঘটনা—সেইদিন মহাজ্ঞানী হইয়াও তাঁহাকে কিরূপ বালকের ন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়াছিলাম তাহাই এখানে বলিতেছি। পূর্ব রাত্রে মঠে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে; এইদিন বৈকালে বিসর্জন হইবে। বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহার ঘরটিতে বসিয়া আছেন ও সেখানে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ [ললিত মহারাজ] এবং আরও কয়েকজন সাধু উপস্থিত আছেন। কমলেশ্বরানন্দ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। তিনি কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের গদাধর আশ্রমে বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন ও বিশিষ্ট বেদ-বেদান্তাভিজ্ঞ কয়েকজন পণ্ডিতসহ ঐ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। আমরা বিজ্ঞান মহারাজজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, তিনি তাঁহার সহিত দেব-দেবীর কয়েকটি বীজমন্ত্রের আলোচনা করিতেছেন ও উহা কেন বিভিন্ন প্রকারের হইল তাহাও ব্যাখ্যা করিতেছেন। যতদূর মনে পড়ে শুনিয়াছিলাম, তিনি ললিত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছেনঃ "আচ্ছা, শিবের মন্ত্রের সঙ্গে 'ঐঁ' বীজটি কেন যুক্ত হ'য়েছে জান? 'ঐঁ' বীজের অর্থ হইল অনন্ত, উদার—আকাশবৎ। শিবও তাই—সেজন্য তাঁর মন্ত্রের সাথে ঐ 'ঐঁ' বীজটি সংযুক্ত হয়েছে।"

এইরূপ আরও নানা কথা হইবার পর ৺কালীপূজা সম্বন্ধে কথা উঠিল। হরিপ্রসন্ন মহারাজ বলিলেন, "পূজায় 'আবাহন'-এর অর্থ তো অন্য কিছু নয়—আমাদের মধ্যে যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রয়েছেন তাঁরই

জাগরণ ও পরে হৃদয়-ঘটে তাঁরই স্থাপন। এরপর পূজক তাঁর শরীরাদি শুদ্ধ করে নিজে দেব বা দেবীস্বরূপ হয়ে তাঁকেই আবার সামনের ঘটে স্থাপন করেন; ঐ ঘটটি আমাদের হৃদয়-ঘটের প্রতীক মাত্র। আবার পূজান্তে তাঁকে পুনরায় 'সংহার মুদ্রায়' প্রতিমা থেকে নিয়ে এসে প্রথমে ঘটে স্থাপন করতে হয়, পরে ঐ ঘট থেকে তাঁকে তাঁর স্বস্থান—হৃদয়-ঘটে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়—এরই নাম 'বিসর্জন'। বিসর্জন অন্য কিছুই নয়। আমরা সর্বদা আমাদের ভিতরে—হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করতে পারি না বলেই আমাদের ঐরকম বাহ্য-প্রতীক অবলম্বন ক'রে তাঁর পূজা করতে হয়।"

সেদিন তাঁহার ঐরূপ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তন্ত্র ও বেদান্তের অপূর্ব-সমন্বয়ের কথা শুনিয়া আমরা খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

কিন্তু বৈকালে আবার তাঁহার অন্য রূপ দেখিলাম। বৈকালে বিসর্জনের সময় আসিলে শ্রীশ্রীমহামায়ার প্রতিমাকে পূজাস্থান হইতে আনিয়া বিসর্জনের জন্য গঙ্গার ঘাটের নিকট রাখা হইল। সাধুগণ মায়ের সম্মুখে ভজনাদি করিয়া মাকে বিদায়-সঙ্গীত শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ তখন মঠে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন নীচে গঙ্গার দিকের একটি বেঞ্চে বসিয়া এই সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিতেছিলেন ও মাকে দর্শন করিতেছিলেন।

এমন সময় বিজ্ঞান মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন,—"পেসন, মা যাচ্ছেন, তাঁর কানে কানে বলে এসো, 'মা, তুমি আবার এসো'।"

শুনিয়াই বিজ্ঞান মহারাজ—যাঁহার মুখে সকালে ঐরূপ বেদান্ত ও তন্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম—তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিমার নিকট গেলেন ও মায়ের কানের নিকট মুখ রাখিয়া কিছু বলিয়া চলিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ,

বলেছি।" মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেছ, পেসন?" তখন বিজ্ঞান মহারাজ ছোট ছেলেটির মত বলিলেন,—"বলেছি, 'মা, তুমি আবার এসো'।"

তাঁহার আর একটি অদ্ভুত বালকবৎ আচরণের কথা এখানে উল্লেখ করিলে, বোধহয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তখন পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ রাত্রে তাঁহার মুখ হাত ধুইবার জন্য প্রায়ই ছাদে যাইতেন না। স্বামীজীর ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াই প্রায়ই উহা শেষ করিতেন। একটি ভক্তের কৃপায় আমাদের তখন খাইবার জন্য কয়েকটি থালা হইয়াছে (পূর্বে শালপাতাতেই আমাদের তু'বেলা খাওয়া হইত)। আমাদের ঐ থালাগুলি খাওয়ার পর রোজই আমরা গঙ্গায় নিয়া গিয়া মাজিয়া আনিতাম। রাত্রে গঙ্গার দিকের সিঁড়ি দিয়া যাইবার সময়ে প্রায়ই উহার উপরে ও নিকটে আমরা ময়লা জল দেখিতাম ও কে এইরূপে সিঁড়িটি নোংরা করে উহা পরস্পরের ভিতরে আলোচনা করিতাম।

একদিন যখন এইরূপ রাত্রে থালা মাজিতে নামিতেছি তখন উপর হইতে এইরূপ জল পড়িতেছে বুঝিতে পারিলাম। আমাদের ভিতরে জনৈক সাধু স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ (সাদা জ্যোতিষ) "কে জল ফেলছে, কে জল ফেলছে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহারও কোন সাড়া না পাইয়া তাঁহার থালাটি আমাদের হাতে দিয়া ঐরূপ চীৎকার করিতে করিতে উপরে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

তার পরদিন সকালে যখন আমরা পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, তখন তিনি তাঁহার তুটি চোখ বড় বড় করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "জান কি ভাই, কাল কি হ'য়েছিল?" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হ'য়েছিল মহারাজ?" তাহাতে তিনি চোখ আরও বড়

করিয়া বলিলেন, "শোনো নি? দেখ, রোজই তো আমি এই বারান্দায় ব'সে রাতে হাত-মুখ ধুই। কালও তাই করছিলাম। এমন সময়ে ঐ সাদা জ্যোতিষটা [আরও একজন জ্যোতিষ মহারাজ ছিলেন; তিনি অপেক্ষাকৃত কাল ছিলেন বলিয়া জ্যোতির্ময়ানন্দ স্বামীকে সাদা জ্যোতিষ বলা হইত] 'জল ফেলে কে? জল ফেলে কে?' বলে মার মার ক'রে উপরে উঠলো। আমি তখন তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম, অত ঝামেলায় কে যায়? আর সে ঐরূপ ক'রে কাউকে না দেখতে পেয়ে নীচে চ'লে গেল।" আমরা বলিলাম, "তা মহারাজ, আপনি কেন বললেন না যে 'আমিই জল ফেলছিলাম'?" তাহাতে তিনি তাঁহার চোখ দুটি আরও বড় করিয়া (যেন খুব ভয় পাইয়াছেন) বলিতে লাগিলেন, "জান না ভাই, ও যেরূপ মার মার ক'রে এসেছিল, তা হ'লে ও নিশ্চয়ই আমাকে মেরে বসত!"

তাঁহার এই বালকের ন্যায় অদ্ভুত ভীতি দেখিয়া আমরা মনে মনে হাসিলাম ও ভাবিলাম সত্যই তো ভগবানের 'বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ' দেখিতেছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য!

শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্বামীজীকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, একদিন উহা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন: "বাপ্, তাঁর সামনে এগোয় কে? আমরা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করতাম। আগুনের কাছে গেলে যেমন আঁচ লাগে, তাঁর কাছে গেলেও ঐরূপ আঁচ অনুভব করতাম; আর তোমরা যেভাবে মহারাজকে পিছন দিক থেকে এসে প্রণাম কর, আমিও তাঁকে (স্বামীজীকে) ঐরূপ করতাম। তিনি মঠে উপস্থিত থাকলে মঠের ওই গেট (এখন যাহার নিকটে সারদাপীঠের প্রদর্শনী-কক্ষ—Show-Room—হইয়াছে) থেকেই তা বোঝা যেত। সারা মঠ তখন গমগম করত। আবার তিনি উপস্থিত না থাকলে মঠের অন্য রূপ।"

আর একদিন আমরা তাঁহাকে একটি পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিয়া কিছু প্রশ্ন করিলে স্বামীজীর সহিত তাঁহার সম্পর্কের মাধুর্য সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলাম। মঠের পোস্তা ও সিঁড়ি বাঁধানোর জন্য পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ ব্যয়ের যে খসড়া হিসাব (Estimate) দিয়াছিলেন তাহার অনেক অতিরিক্ত খরচ হওয়ায় স্বামীজী শ্রীশ্রীমহারাজকে খুবই তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীমহারাজও তখন সজল নয়নে বিজ্ঞান মহারাজকে বলিয়াছিলেনঃ "পেসন, তোমারই জন্য আজ আমাকে স্বামীজীর কাছে এরকম গালাগাল খেতে হল।" এই শ্রুত ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে আমরা পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেনঃ "হ্যাঁ ভাই, এটি সত্য।" আমরা আশ্চর্য হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ, আপনি এর আগে তো কতই এমন খসড়া হিসেব করেছেন, তবে এরূপ ভুল হিসেব করলেন কেন?" —তিনি উহার জন্য মাত্র আটশো টাকা হিসাব দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী যখন মহারাজের নিকট হিসাব চাহিলেন তখন উহার জন্য পনেরশো টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, তখনও কিন্তু উক্ত প্রকল্পটি অর্ধসমাপ্ত। —তদুত্তরে তিনি বলিলেনঃ "জান কি ভাই, স্বামীজীকে ঐ রকম অল্পব্যয়ের খসড়া হিসাব না দেখালে তিনি কি কখনও ঐ কাজে হাত দিতেন?" ইত্যাদি।

মনে হয়, ইহারই কিছু পরে পুনরায় স্বামীজীর গালাগালি খাইবার ভয়ে তিনি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকটে কিছুদিন থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া একটি চলতি নৌকা ডাকিলেন এবং উহাতে যেমনই উঠিতে যাইতেছেন, স্বামীজী উপর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পেসন, যেও না, যেও না, তুমি রাজার (মহারাজ) কাছে যেও না—রাজা খুব ভাল লোক নয়।" তারপর তিনি বলিলেন—"আমি কি আর শুনি! তখনই নৌকোয় চড়ে তার ছইয়ের নীচে গিয়ে বসলাম।"

এইরূপই ছিল তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ গভীর প্রেম ও প্রীতিমধুর কলহ।

তিনি বলিতেন: "এখনও স্বামীজী তাঁর ওই ঘরটিতে রয়েছেন। তাই ঐ ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি অতি সন্তর্পণে যাই, পাছে তাঁর ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটে। তাঁর শরীর থাকতে একদিন তাঁকে ঐ ঘরে বসে ধ্যান করতে দেখেছিলাম। সে সময় তাঁর শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে সমস্ত ঘরটি আলোকিত দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি কি সাধারণ মানুষ!"

শ্রীশ্রীঠাকুরের (বেলুড় মঠের) বর্তমান মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'দেখ, পেসন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের একটা নকশা করতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন ছিলেন সকল ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ, তাঁর মন্দিরেও ঐরূপ সর্ব দেশের—গ্রীক, রোমান, Saracenic (মুসলমান) ও হিন্দু প্রভৃতির শিল্পকলার সমবায় থাকবে। তুমি ঐ রূপ একটা নকশা কর তো।' এই বলে স্বামীজী ঐ সব দেশের বিভিন্ন শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তার কতটুকু আমি বুঝলাম জানি না, তবে তাঁহার আদেশ পেয়ে যেটুকু বুঝেছি কয়েকদিন খেটে সেরূপ একটি নকশা প্রস্তুত করে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি নকশার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'বেশ হয়েছে'।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন মন্দির নির্মাণকালে উহার ভিত্তি-প্রস্তরখানি যেখানে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ উহাকে পূর্বে স্থাপিত করিয়াছিলেন সেইখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া বিজ্ঞান মহারাজ যখন বর্তমান মন্দিরের নীচে পুনঃ স্থাপন করেন, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাঁহার নিকটেই ছিলাম। দেখিলাম, তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া গদগদ স্বরে বলিতেছেন:—"স্বামীজী, স্বামীজী, তুমি তো বলেছিলে—'যখন

শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণ হবে, পেসন, তখন আমি হয়ত আর এ শরীরে থাকব না, কিন্তু ওপর থেকে তা আমি দেখব'—আজ তো এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, স্বামীজী, ওপর থেকে তুমি তা দেখ।"

ইহা বলিয়াই প্রতিষ্ঠাকার্য শেষ হইলে তিনি ছলছল চক্ষে নিজ ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহারাজ, আপনি কি সত্যই সেদিন স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, শুধু স্বামীজী কেন, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীমহারাজ প্রভৃতিও সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ করে গিয়েছেন। তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েই তো কাজ আরম্ভ করেছি।"

তাঁহার দিব্যদর্শনাদি সম্পর্কে তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, আমার ঐরূপ কিছু কিছু হয়েছে; কিন্তু মহারাজের আরও অনেক বেশী।" এই বলিয়া কৌতুকভরে বলিলেন, "তবে ব্যাপার কি জান? আমার মাথাটা কিছু গরম—আর মহারাজের আরও বেশী।"

এই প্রকার কৌতুকচ্ছলে তিনি আমাদের কত গভীর তত্ত্বই না শুনাইয়াছিলেন! যে-সকল অপূর্ব উপাদানে তাঁহার পবিত্র ও উন্নত জীবন গঠিত ছিল, সেইগুলি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভে ধন্য সকলের জীবনেই অল্প-বিস্তর প্রতিফলিত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রধান সেবক বেণীর সম্বন্ধে কিছু বলা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। বেণী দরিদ্রের সন্তান, শৈশবেই পিতৃহীন। দারিদ্র্যের তাড়নায় সে অতি শৈশবে পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজের নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে চাকর হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, প্রথমাবধি নিজ সন্তানের মতই পরম স্নেহে কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। বেণী না হইলে তাঁহার কোনও কর্মই যেন সমাধা হইত

না। কখনও তিনি তাহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিতেন, কখনও বা 'বেণীবাবু' বলিয়া সন্তানোচিত আদর করিতেন। তাঁহার শরীরের সেবা বেণী ব্যতীত অপর কাহারও করিবার অধিকার ছিল না। যখন তিনি বেলুড় মঠে বিশেষ অসুস্থ তখনও দেখিয়াছি, তিনি সাধুদের সেবা পছন্দ করিতেছেন না এবং তাঁহারই আদেশক্রমে টেলিগ্রাম করিয়া বেণীকে এলাহাবাদ হইতে আনা হইল। বেণী তাঁহার সকল সেবার ভার লইলে তিনিও নিশ্চিন্ত হইলেন।

যখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার শরীর আর বেশীদিন থাকিবে না তখন একদিন বেণীকে ডাকিয়া বলিলেনঃ "বেণী, তোর জন্য কিছু টাকা আমি রেখে যেতে চাই, নয়ত আমার শরীর গেলে তোর নিজের ভরণ-পোষণের জন্য হয়ত কষ্ট হবে।"

দরিদ্র-সন্তান বেণী কিন্তু তখন হাত জোড় করিয়া বলিলঃ "মহারাজ, আপনার কৃপায় আমার সবই হয়েছে (বেণীর বয়স তখন প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর, বিবাহ করে নাই)। আমি আপনার কাছে আর কিছুই চাই না—শুধু আশীর্বাদ করুন যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর আমার অচলা ভক্তি থাকে।" এলাহাবাদ আশ্রমবাসিগণ বলেন যে, তখন বিজ্ঞান মহারাজ তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেনঃ বেণী, যদি এই হাত দিয়ে কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের এতটুকুও সেবা করে থাকি, তবে আশীর্বাদ করছি—তাঁর চরণে তোর অচলা ভক্তি থাকবে।"

বলিতেছে। হয়ত তাহারা ইহাও ভাবিয়াছিল
তাহার উপর ঐরূপ নির্ভর করিতেন, তখন
দিয়া গিয়াছেন এবং তাহার ঐরূপ

ঐকান্তিক সেবাদির জন্য সে হয়ত আশ্রম হইতে আরও কিছু পাইতে পারে। বেণী কিন্তু কাহারও কথা শুনিল না। সে শুধু বলিল: "মহারাজ আমাকে এখানে রেখে গিয়েছেন, আমি এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলব।"

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে বেণীর কঠিন অসুখ হইল। পূজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজ তখন ৺কাশী সেবাশ্রমে। তিনি বেণীকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি এলাহাবাদ আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষকে বেণীকে ৺কাশীতে পাঠাইতে বারংবার লিখিতে লাগিলেন। কারণ কাশী সেবাশ্রমে তাহার সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। বেণী কিন্তু নিজ সংকল্পে দৃঢ় রহিল। সে কেবল বিনীতভাবে বলিল: "মহারাজের আশ্রমে অতি শৈশবে এসেছি, তাঁর স্নেহেই মানুষ হয়েছি; আমাকে আপনারা দয়া করে এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমি এ আশ্রম ছেড়ে যাব না।" শঙ্করানন্দ মহারাজ ইহা শ্রবণ করিয়া নিজেই এলাহাবাদে গিয়া তাহাকে আনিবার সঙ্কল্প করিলেন। বেণী যখন শুনিল যে, তিনি উহার জন্য অমুক তারিখে এলাহাবাদে আসিতেছেন, সে সেই দিনই সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিল।

এইরূপে অবহেলিত লৌহও স্পর্শমণির স্পর্শে উজ্জ্বল সুবর্ণে পরিণত হইয়াছিল—সাধুসঙ্গের ইহাই মহিমা!

বিজ্ঞান মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর দুইটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন—যাহা তিনি শেষাবধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। উহার প্রথমটি ছিল এইরূপ: "যখন ধ্যান করবে তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে তা করবে।" সেইজন্য আমরা দেখিতাম, রাত্রে আহারাদির পরই তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িতেন। আমরা ভাবিতাম, উহা তাঁহার অভ্যাস। তখন আমরা তাঁহার ঘরের নিকট স্বামীজীর বারান্দায় শুইতাম। সে সময় কখনও হঠাৎ ঘুম

ভাঙিলে দেখিতাম, তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া আমাদের পাশ দিয়া ছাদের দিকে হাত-মুখ ধুইতে যাইতেছেন। তাঁহার এইরূপ উলঙ্গ অবস্থার কারণ আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশমত সর্ববন্ধনশূন্য হইয়া শায়িত অবস্থাতেও তিনি ঐরূপ ধ্যান করেন।

তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্য আদেশটি ছিল,—"সোনার মেয়েমানুষ যদি ভক্তিতে গড়াগড়িও দেয়, তবুও তুমি তার দিকে কখনও ফিরেও চেয়ো না।" মঠের প্রেসিডেণ্ট হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইহা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। উহার কিছু পূর্বে যখন তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে শেষ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন বাক্‌রহিত অবস্থাতেও বাঁ হাত তুলিয়া তাঁহাকে কৃপা করিতে ও সকলকে আশীর্বাদ করিতে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব মনোভাব একেবারেই বদলাইয়া যায়। তিনি বলিতেন: "মহাপুরুষ মহারাজের ঐ উদার ভাব তখন আমার ভিতরে যেন ঢুকে যায়।" তারপর থেকে তিনি স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে দীক্ষা দিতেন। এবিষয়ে হয়ত ঠাকুরের আদেশও তখন পাইয়াছিলেন। তৎপূর্বে কোনও স্ত্রীলোক তাঁহার এলাহাবাদ আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিত না। তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন যে, বিজ্ঞান মহারাজের আশ্রমে স্ত্রী-মাছিটিরও প্রবেশ করিবার জো নাই।

তিনি যখন স্বামীজীর মন্দিরের নির্মাণকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন সেই সময় আমরা জনৈকা ভক্তিমতী মহিলাকে লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করাইতে গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ মহিলাটিকে খুবই স্নেহ করিতেন। মহিলাটি বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। প্রণামান্তে মাথা উঠাইয়া মহিলাটি তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিলেন। আমরাও তখন উহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। পরে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশেই যে তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম।

এইরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও বালকোচিত সারল্যের সহিত তাঁহার আচরণে অপূর্ব সংযম, নিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

সাধারণের সহিত আচরণে তিনি আমাদের ন্যায় কোনও মৌখিক ভদ্রতার (**Formality**) ধার ধারিতেন না। হয়ত একঘর লোকের সহিত তিনি ধর্ম বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাও উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় তাঁহার ভাব (**Mood**) বদলাইয়া গেল ও তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া—"তাহলে আপনারা এখন আসতে পারেন"—এই বলিয়াই তাঁহাদের সম্মুখে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ অদ্ভুত বালকোচিত ব্যবহার আমরা তাঁহার আচরণে প্রায়ই দেখিতে পাইতাম—যাহা আমাদের আচরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"বুধো বালকবং……" ইত্যাদি।

তিনি মঠের প্রেসিডেণ্ট হইবার পরও তাঁহার ঐ প্রকার অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়াছি। ভক্তেরা তাঁহার জন্য নানারূপ মিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি সানন্দে উহা আমাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। আবার কখনও বা বহু মিষ্ট দ্রব্যাদি একত্রিত হইলেও তাঁহার সেবকদের বলিতেন: "ও আর আজ কাউকে দেওয়া হবে না। সবটুকুই আমার জন্যে রেখে দাও।" পরদিন হয়ত তার সবটাই নষ্ট হইয়া যাইত এবং তাহা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইত।

তিনি দীক্ষাদি দেওয়া আরম্ভ করিবার পর ভক্তেরা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ অনেক বস্ত্রাদি তাঁহাকে দিতেন। উহা কখনও কখনও তিনি মঠের উপস্থিত সাধুদের বিতরণ করিয়া দিতেন। আর কখনও বা বলিতেন: "ওর থেকে একটিও কাউকে দেওয়া হবে না, সবই আমি এলাহাবাদে নিয়ে যাব।"

সেবকগণ হয়ত জিজ্ঞাসা করিলেন: "সেখানে এত কাপড় নিয়ে গিয়ে কি করবেন?" তিনি বলিতেন: "ও আমার ভাণ্ডারায়

লাগবে।” ঐরূপে একবার দুই বাক্স বোঝাই কাপড় তিনি এলাহাবাদ লইয়া যান। তাহার কিছুদিন পর তাঁহার শরীর যাওয়ায় ঐ কাপড়গুলি বাস্তবিক তাঁহার ভাণ্ডারায় লাগিয়াছিল ও উহা উপস্থিত সাধুদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

এইরূপ ছিল তাঁহার অদ্ভুত আচরণ, আমাদের চক্ষে যাহা ‘বালকবৎ’, ‘উন্মাদবৎ’ প্রতিভাত হইত। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত পরমহংস সন্ন্যাসীদের পূর্বোক্ত বিশেষণগুলির তাৎপর্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমরা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছি।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য যে সকল পার্ষদগণের সহিত আমাদের কথঞ্চিৎ মিশিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁহাদের অন্যতম। আমরা যখন মঠে প্রবেশ করি তখন তিনি সারগাছিতে (মুর্শিদাবাদে) তাঁহার ক্ষুদ্র অনাথাশ্রম লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার হৃদয়বত্তা ও কর্মতৎপরতার কথা আমরা তখনই শুনিতে পাইতাম ও শুনিতাম যে তিনি একরূপ দৈবাদিষ্ট হইয়াই মুর্শিদাবাদ সারগাছিতে ঐ ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে কতকগুলি অনাথ বালক থাকে। তিনি সেখানে একাধারে তাহাদের পিতা-মাতা বন্ধু ও সাথী। এবং ঐ আশ্রমটি শ্রীশ্রীস্বামীজীর কর্মযোগের আদর্শের প্রথম প্রবর্তনা। তিনি (গঙ্গাধর মহারাজ বা অখণ্ডানন্দ স্বামী) পরিব্রাজক অবস্থায় ভারতের, এমন কি তিব্বতের অনেক স্থান ঘুরিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই দরিদ্রদিগের অসহায় অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করিতেন, ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে উহাদের দুঃখকষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘবের জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার সরলতার পরিচয় আমরা মঠে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি যখনই মঠে আসিতেন, সেখানে দুই-চারিদিন থাকিবার পরই সারগাছি আশ্রমে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি মঠে আসিলে শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) তাঁহাকে লইয়া নানারূপ কৌতুক করিতেন। ও যখনই সারগাছির জন্য তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতা দেখিতেন তখনই বলিতেন, "কি হবে গঙ্গা সেখানে গিয়ে? সেখানে তো কয়েকটি বাপ-মা খেদান ন্যাংটা ছেলেদের নিয়ে আছ। এখানে কত সাধু ব্রহ্মচারী আসছে। তাদের নিয়ে থাক ও তাদের শিক্ষাদি

দাও না কেন?" ইহা যে শ্রীশ্রীমহারাজের অন্তরের কথা নহে তাহা গঙ্গাধর মহারাজ বুঝিতে পারিতেন না এবং আরও ব্যাকুল হইয়া বলিতেন, "না, না, মহারাজ তুমি বুঝছ না, আমি না গেলে ঐ সব ছেলেদের অত্যন্ত কষ্ট হবে।" শ্রীশ্রীমহারাজও তাঁহার সেই পূর্বকথা পুনরায় আবৃত্তি করিতেন ও গঙ্গাধর মহারাজও ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইতেন ও অবশেষে মঠে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন।

তাঁহার সরলতা লইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ও তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ কত না কৌতুক করিতেন ও আমরা তাঁহার সেই দেবদুর্লভ সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার কোথাও যাইবার প্রাক্কালে তাঁহার সে যাত্রাটি ভঙ্গ করিবার কৌশল আমরা অনেকেই জানিতাম। শুধু তাঁহাকে তখন বলিলেই হইত, "মহারাজ, আপনার 'তিব্বতের ভ্রমণ কাহিনী' যদি আমাদিগকে আরেকবার বলেন তাহলে খুব ভাল হয়।" অমনি দেব-দুর্লভ সরল বৃদ্ধ বসিয়া পড়িতেন ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া উহার সেই রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিতেন। এদিকে যে তাঁহার ট্রেন ছাড়িবার সময় আগাইয়া আসিয়াছে ও তাঁহাকে স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার গাড়ীও উপস্থিত তাহা তিনি সব ভুলিয়া যাইতেন। সেই ভ্রমণ কাহিনী শেষ করিয়া যখন তিনি স্টেশনে পৌঁছাইতেন তখন প্রায়ই দেখা যাইত যে সেদিনের ট্রেন অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ হয়ত পরপর কয়দিনই তাঁহার গাড়ী ফেল করিতে হইত ও ভক্তেরা তাঁহাকে পুনঃ পাইয়া খুবই আনন্দ করিতেন।

তাঁহার এই সরল ব্যবহারের পরিচয় আমার সৌভাগ্যেও কিছু ঘটিয়াছিল। তাহা এখানে বর্ণনা করিতেছি। খুব সম্ভব তখন ১৯২১ বা ১৯২২ সাল হইবে। পূজনীয় অভেদানন্দজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েকদিনের জন্য বাগবাজারের বলরামবাবুর বাড়ীতে (বলরাম

মন্দিরে) বাস করিতেছেন। আমিও তাঁহার সেবক হিসাবে সেখানে আছি। এমন সময় একদিন পূজনীয় গঙ্গাধব মহারাজও সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেই সময় কোনও কার্য উপলক্ষে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী (জিতেন মহারাজ) ও স্বামী নির্বাণানন্দজী সেখানে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহারা ধরিয়া বসিলেন—আজ অনেকদিন পরে আপনাকে পাইয়াছি। আজ আপনার আমাদের সহিত একটু তাস খেলিতে হইবে। অনেকদিন ত আপনি আমাদের সহিত তাস খেলেন নাই। তিনি প্রথমে না, না করিলেন, পরে রাজী হইলেন। কিন্তু আরেকজন খেলার সাথী কোথায় পাইবেন? আমাকে সামনে দেখিয়াই তিনি সস্নেহে ডাকিয়া বলিলেন, "এস, এস তুমি আমার দিকেই খেলবে ও ওরা দুজন অপরদিকে খেলবে।" ইহাতে আমি তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, "মহারাজ, আমি তো বিন্তি খেলা বাল্যকালে খেলেছিলাম মাত্র, এতোদিনে তা একেবারে ভুলে গেছি।" কিন্তু বৃদ্ধ নাছোড়বান্দা, বলিলেন, "ওতেই হবে, তুমি আমার দিকে বসে পড়।" ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। আমরা ক্রমাগত হারিতে লাগিলাম। ও বৃদ্ধ প্রতিবারই বলিতে লাগিলেন, "এঃ, এ দেখছি কিছুই জানে না।" আমি তদুত্তরে প্রতিবারই সবিনয়ে বলিতে লাগিলাম, "মহারাজ, আমি তো ইহা পূর্বেই বলেছি।" কিন্তু তবুও বৃদ্ধ ছাড়িবার নন। অবশেষে ছক্কা-পাঞ্জা উভয়েই আমাদের উপরে পড়িল। এমন সময় আরেকটি ভক্ত আসিয়া পড়ায় মহারাজ বলিলেন, "এবার তুমি ওঠ, ওই আমার দিকে বসবে।" আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু দরজার নিকট যাইতে না যাইতেই বৃদ্ধ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "চলে যেও না, তুমি বরং আমার পেছনে বসে আমাকে কখন কি তাস ফেলতে হবে দেখিয়ে দাও।" ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। আমরা একেবারেই হারিয়া গেলাম। আবার বৃদ্ধের মুখে সেই কথা, "দেখছি ছেলেটি কিছুই

জানে না।" আমিও মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, "মহারাজ তাতো বহুবার বলেছি।" এইরূপই ছিল তাঁহার বালসুলভ সরলতা—যাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম।

আর একদিনের কথা :—তখন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত অসুস্থ। হাঁপানিতে খুবই কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার এই অসুস্থতার কথা মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে জানানো হইয়াছে। খবর পাইয়াই পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ মঠে আসিয়া উপস্থিত ও শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়া একেবারে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দাদা, দাদা, আপনি আপনার শরীরকে এরূপ করলেন কি করে?" আপনি চলে গেলে আমরা কাকে নিয়ে থাকব?" ইত্যাদি। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার বালক-স্বভাবের কথা জানিতেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন, "বোস্ বোস্, তোর ওখানের কি খবর বল্।" বলিতেই তিনি সেখানের তাঁহার কৃষি প্রভৃতির কথা বলিতে শুরু করিলেন ও বলিলেন, "দাদা, কি আর বলবো, এবার ওখানে যে পটল হয়েছিল তার পরিমাণ কয়েক মণ হবে। কিন্তু পাছে কেউ ওগুলি চুরি করে নিয়ে যায়, তাই ক্ষেতের মাঝখানে একটা চালা ঘর করে দিয়েছিলাম কিন্তু দাদা, বুকের ওপরে ঘর, তা তারা সহ্য করবে কেন? অমনি দেখতে দেখতে সব পটল গাছ শুকিয়ে গেল। বুকের উপরে ঘর ছিল কিনা।" দাদাও বলিলেন, "তা বলেছিস ঠিকই।" আমরাও এই স্বর্গীয় দুই ভ্রাতার আলাপন শুনিয়া মনে মনে খুবই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

এইরূপই ছিল তাঁহার বালসুলভ সরলতা! কিন্তু তাঁহার এই অদ্ভুত সরলতার সহিত দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার যে ঐকান্তিক কামনা ও অদ্ভুত দূরদৃষ্টির পরিচয়ও আমরা পাইয়াছিলাম তাহা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহার অনেক কথাই আমরা তখন কিছু বুঝিতে পারি নাই কিন্তু পরে উহাদের পরিণতি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে

এই সরল বৃদ্ধের দূরদৃষ্টি ও দেশের ঐকান্তিক মঙ্গল কামনা কতদূর সুদূরপ্রসারিত।

একদিন তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে মঠে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকট বলিলেন যে, "দেখ, আজ হেঁটে হেঁটে ব্যারাকপুরে সুরেন বাবুর (স্যার সুরেন ব্যানার্জীর) বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সেখানে অতি কষ্টে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তখন তাঁকে বললাম, 'আপনারা এ কি ভাবে কংগ্রেস পরিচালনা করছেন। দেশের মঙ্গল চাইলে গ্রামে যেতে হয়। সেখানে সহস্র সহস্র গ্রামবাসী রয়েছে, যারা আপনাদের কোনও কথাই জানে না। আপনারা এখন শুধু শহরে বসেই কংগ্রেসের কথাবার্তা আলোচনা করছেন। এতে ঐসব নিরক্ষর দেশবাসীর কি উপকার হচ্ছে? আপনারা গ্রামে গিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন করেন না কেন? কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টকেই বা আপনারা ঐরূপ সাজ-সজ্জা করিয়ে বড় বড় গাড়ীতে চড়িয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন মঞ্চে নিয়ে আসেন কেন? গ্রামের দরিদ্রদিগের সহিত এক হয়ে যান। গ্রামেই কংগ্রেসের অধিবেশন করুন ও কংগ্রেসের সভাপতিকে গরুর গাড়ীতে করে নিয়ে যান, যাতে গ্রামবাসিগণ এই অধিবেশনটি তাদেরই ও কংগ্রেসের সভাপতি তাদেরই লোক বলে বুঝতে পারবে'।" ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মহাশয় কি বলিয়াছিলেন, আমাদের জানা নেই, তবে উহার কয়েক বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন শুরু হইলে যে উহার অধিবেশন এক গ্রামেই হইয়াছিল ও সেখানে প্রেসিডেণ্টকে ঐরূপ গরুর গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল উহা দেখিয়া আমরা ঐ বৃদ্ধের কথার সারবত্তা ও তাঁহার দূরদৃষ্টির কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম

আর একদিন তিনি ঐরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে মঠে আসিয়া বলিলেন, "দেখ, আজ কলকাতায় আশুবাবুর (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম তাঁর ঘর ভর্তি

বই, থাকে থাকে সাজানো। এগুলির অধিকাংশই দেখলাম ইংরাজী ভাষায় লেখা পুস্তক। (তিনি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।) বহুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করবার পর তাঁর সহিত দেখা হলে তাঁকে বললাম, 'আপনি তো এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। আপনি এতে সংস্কৃত ভাষার বহু প্রচলন করেন না কেন? সংস্কৃতই তো আমাদের জাতির মেরুদণ্ড'।"

তখন আশুবাবু তাঁহার এই কথার সারবত্তা কি বুঝিয়াছিলেন জানি না কিন্তু কয়েক বৎসর পরে **Lord Ronaldshay**-র **'Heart of Aryavarta'** নামক পুস্তকটি বাহির হইলে উহা পড়িয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম যে এতদিনে সেই বৃদ্ধের বাণী সফল হইতে চলিতেছে। উহাতে **Ronaldshay** লিখিতেছেন যে, "আজ যদি মেকলে কলকাতায় আসতেন ও কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় দেখতেন তা হলে বুঝতে পারতেন যে, যে ভাষাকে (সংস্কৃত) তিনি অবজ্ঞাভরে এক সময়ে মৃত ভাষা বলে উল্লেখ করেছিলেন ও বলেছিলেন যে উহার (সংস্কৃত ভাষার) যতগুলি বই আছে তা আমাদের যে কোন লাইব্রেরীর একটি আলমারীতে রাখলেই যথেষ্ট হবে," আজ সেই ভাষাতেই ১২টি বিভিন্ন বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হইতেছে।

উহা পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে সেই ভাবপ্রবণ সরল বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি সেদিন আশুবাবুর সহিত যে কথা বলিয়াছিলেন আজ দেখিতেছি তাহাই বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী এইরূপেই তাঁহার শিষ্যগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কতরূপে কতদিকে প্রচার করিয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? আমরা শুধু তাঁহাদের বাহিরটিই দেখিয়াছি। ভিতরে ঢুকিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের উহা যথার্থরূপে বুঝিবার সামর্থ্য দিন, ইহাই প্রার্থনা।

স্বামী সুবোধানন্দ

মঠে যোগদানের পর প্রায় আড়াই বৎসরকাল আমাদের মঠ-বাসের সৌভাগ্য হইয়াছিল। সে সময়ে আমরা পূজনীয় খোকা মহারাজের নিকটেই থাকিতাম। তখন মঠের অফিস ও লাইব্রেরী স্বামীজীর ঘরের পশ্চিমে বড় ঘরে ছিল। আমাদের তখন ঐ অফিসের ও লাইব্রেরীর কিছু কিছু কাজ করিতে হইত বলিয়া আমরা অধিকাংশ সময়ই উপরে পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘরের নিকটেই থাকিতাম। রাত্রেও নীচে শুইবার স্থানাভাবে খোকা মহারাজের ঘর ও স্বামীজীর ঘরের মাঝের ছোট বারান্দাতেই আমাদের শুইতে হইত। কিন্তু তাঁহার এতো নিকটে থাকিয়াও সে সময়ে আমরা তাঁহার কোন বিশেষত্ব বা মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই। তিনি বাস্তবিকই খোকার মতনই ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গেই পঙ্গতে বসিয়া খাইতেন ও সকল বিষয়ে আমাদের মতনই ব্যবহার করিতেন। ছোট একটি জামা ও ছোট একটি কাপড় পরিতেন ও নিজেই উহা পরিষ্কার করিতেন। তখন তাঁহার কোনও সেবক ছিল না। আমাদের ডাকিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার চিঠি লেখাইতেন। কিন্তু পাশের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন ও অনুচ্চ স্বরেই আমাদিগকে তাঁহার চিঠির মর্ম বলিয়া যাইতেন। এমন সময় যদি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের একটু ডাকিতেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিঠি লেখা বন্ধ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে বলিতেন। তিনি তামাক খাইতেন কিন্তু কখনও তাঁহাকে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সম্মুখে তামাক খাইতে দেখি নাই। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সহিত আচরণেও তাঁহাকে খোকার মতন ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি।

একদিন ঢাকা হইতে কয়েকটি ভক্ত পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসায় তিনি তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া সেখানে যাইতে অস্বীকার করেন ও পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘরে আসিয়া বলেন যে, "খোকা, এই সকল ভক্তেরা ঢাকা হতে সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। তা আমার তো শরীর খারাপ তুই একবার সেখানে যা না।" তাহাতে খোকা মহারাজ তাঁহার চোখ দুটি বড় বড় করিয়া বলিলেন, "না ,না, আমি সেখানে যেতে পারব না। সেদিকে যেতে যে বড় বড় নদী পড়ে তা দেখলে আমার ভয় করে।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও খোকা মহারাজের খোকাত্ব বুঝিয়া আর এই বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কিন্তু ইহার দু-তিন বৎসর পরে তাঁহাকে অবশ্য ঢাকায় যাইতে হইয়াছিল। ঢাকা বালিয়াটি গ্রামে তদানীন্তন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ও সেখানকার জমিদার ৺যামিনী রায়ের বাড়ীতেও একটু পদার্পণ করিতে হইবে বলিয়া তিনি সেখানে যাইতে অগত্যা রাজী হইয়াছিলেন ও চার-পাঁচটি সাধু লইয়া সেই সময় ঢাকা রামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়াছিলেন। তখন আমরা ঢাকা আশ্রমের কর্মী। সেই সময় আমরা তাঁহার যথার্থ মাহাত্ম্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া নিজেরা ধন্য হইয়া গিয়াছিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি আমাদের কয়েকজন সাধু ও ভক্তকে লইয়া বালিয়াটি গ্রামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার জন্য রওনা হন। যামিনীবাবুই আমাদের সকলের যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ঠিক হইল মাণিকগঞ্জ পর্যন্ত স্টীমারে যাইব ; মধ্য পথে তাঁহার আড়তে, যেখানে তাঁহার ব্যবসায়ের আদান-প্রদান হইত, সেইখানে আমাদের বিশ্রাম ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়। আমরা সেই সময় দলে আট-দশজন ছিলাম। আড়ত বাড়ীটি

ছোট। সুতরাং আমাদের সকলের একত্রে রাত্রিবাসের জন্য বড় সতরঞ্চি বিছাইয়া দেওয়া হইল। উহাতে আমরা যে যাহার ছোট ছোট বিছানা লইয়া শুইয়া পড়িলাম। আমার বিছানাটিও পূজনীয় মহারাজের পাশেই করা হইল, কেননা আমিই সে দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম ও বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাঁহার পাশে শুইতে অত্যন্ত সংকোচবোধ করিতেছিলেন। সেইজন্যই এরূপ ব্যবস্থা হইল। সেদিন রাত্রি ঠিক চারটে বাজিলে, দেখি পূজনীয় খোকা মহারাজ তাঁহার শয্যায় বসিয়াই গভীর ধ্যানে মগ্ন। আমিও তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পাশে ধ্যান করিতে বসিলাম। সজ্জনের ক্ষণেক সঙ্গ পাইলেও আমাদের জীবন অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে।

এইখানে বালিয়াটিতে আমরা কয়েকদিন ছিলাম। এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও অনেক জমিদারের বাস। তাঁহারা পরস্পর সর্বদাই কলহে ব্যস্ত থাকিতেন কিন্তু পূজনীয় মহারাজের আগমনে তাঁহাদের কলহ মিটিয়া গেল। আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইল ও উহার তদানীন্তন পরিচালক রাধিকামোহন অধিকারী কিছুদিন পরে মঠে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ও স্বামী সুন্দরানন্দ নামে আখ্যাত হইয়া দীর্ঘকাল উদ্বোধনে সম্পাদকের কার্যনির্বাহ করিয়াছিলেন।

ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াও শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের সহিত ছিলেন ও নিত্যই আমাদিগকে তাঁহার পূর্বজীবনের তপস্যা ও তীর্থভ্রমণাদির কাহিনী শুনাইয়া ও নানাবিধ উপদেশাদি দিয়া আমাদিগের সাধুজীবন পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। এইসময় তিনি আমাদের গিরিশবাবু সম্বন্ধে নানাবিধ কথা বলেন। তিনি বলিতেন, গিরিশবাবুই ছিলেন যথার্থ বিশ্বাসী ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনিই ঠিক ঠিক চিনিয়াছিলেন। গিরিশ বলিতেন, "ওরে চৈতন্যদেব আর কি করেছেন। তিনি বড়জোর জগাই মাধাই নামক দুটি পাষণ্ডকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু জগাই মাধাই তো আমাদের জীবনের একাংশের একটি ছবি মাত্র। আমি যেখানে বসতাম

মনে হত সেখানের সাতহাত মাটি পর্যন্ত অপবিত্র হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ন্যায় এরূপ পাষণ্ডকেও কি উচ্চাবস্থাতেই উঠিয়ে দিলেন। তাঁকে অবতার বলব না তো কাকে বলব।"

একদিন ধ্যানজপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, "দেখ ধ্যানজপ না করলে যত উচ্চ পুরুষের নিকট হতেই দীক্ষাদি লও না কেন তা কখনও পরিস্ফুট হয় না।" এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দেখ বৃন্দাবনের কুসুম সরোবরে আমি পূজনীয় মহারাজের সাথে তপস্যা করেছিলাম। কিন্তু আমার তো শৈশব হতেই চা খাওয়া একটি রোগ, তোমরা জান। তাই সকাল হলেই একটি নারকেলের মালা হাতে করে গোস্বামীজীর (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) আশ্রমে উপস্থিত হতাম ও সেখানে চা পান করে কিছুকাল পরে কুসুম সরোবরে ফিরে আসতাম। ঐ স্থান হতে ঐরূপ অনুপস্থিতি শ্রীশ্রীমহারাজ লক্ষ্য করেছিলেন ও একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'খোকা তুই না এখানে তপস্যা করতে এসেছিস! তবে এরূপ ছটফট করে কেন এখান হতে বের হয়ে পড়িস্'? তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর তো আমাদের সকলই দিয়ে গিয়েছেন তবে আবার তপস্যার প্রয়োজন কি?' তাহার উত্তরে মহারাজ একটু গম্ভীর হইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'সে সত্যই খোকা, তিনি সবই দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে জপধ্যানাদির দ্বারা ইহা উপলব্ধি কর।' তাই তোমাদেরও বলি যে তোমরা যার কাছ থেকে যেরূপ দীক্ষাই পেয়ে থাক না কেন উহা জপ-ধ্যানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ কর, শুধু বসে থাকলে চলবে না।" ইহার উত্তরে আমরা কখনও কখনও বলিতাম, "মহারাজ, সারাদিন মঠমিশনের কাজ করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই সকাল সকাল উঠে ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান আমরা করতে পারি না। আবার মিশনের কাজে আমাদের বের হতে হয়।" তদুত্তরে তিনি বলিতেন, "রাত্রে কম

করে খেও ও শোবার সময় মন হতে সকল কাজের চিন্তা দূর করে দিও, তাহলেই দেখবে শান্তিতে ঘুমাবে ও সকালে উঠে আর কোনও ক্লান্তি বোধ করবে না।"

তিনি দিনে ও রাত্রে অতি অল্পই খাইতেন। যদি কোনও ভক্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি খাওয়াবে?" ভক্তটি হয়তো তাঁর বিনয়বশতঃ বলিতেন, "কি আর খাওয়াব। শুধু চারটি ডাল আর ভাত।" তিনি যথাসময়ে সেখানে গিয়া আহারে বসিতেন ও তাঁহার থালায় নানাবিধ পঞ্চব্যঞ্জনাদি থাকিলেও তিনি তাহাদের কিছুই স্পর্শ করিতেন না শুধু ডাল ভাত খাইয়াই চলিয়া আসিতেন। ভক্তটি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও তাঁহার ইহাতে অন্যথা হইত না। তিনি বলিতেন, "কথার সত্যতা রাখিতে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন।"

ইহা ১৯২৫ সালের ঘটনা। ইহার পরবৎসর তিনি আবার কয়েকজন সাধু লইয়া ঢাকা মঠে আসিলেন ও ইহার কিছুদিন পরে সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমাদের কয়েকজন ও পূর্বোক্ত সাধুগণকে লইয়া সেখানে রওনা হইলেন। পুণ্য ৺অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে সেখানকার মন্দিরে তাঁহারই শুভহস্তে শ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বৈকালে সেখানে একটি জনসভা হয় ও পূজনীয় মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় যতদূর মনে পড়ে বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি যে সর্বধর্মের প্রতীক ইহা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। সকলেই উহা শুনিয়া মুগ্ধ হন ও হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে অতঃপর প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ইহার পর পাঁচ-ছয় বৎসর আমাদের সহিত তাঁহার আর দেখা হয় নাই। আমরা মঠ-মিশনের কার্যে নানা স্থানে ব্যাপৃত ছিলাম ও পূজনীয় খোকা মহারাজের শরী সোনারগাঁ হইতে আসিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমের

জন্য ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহাকেও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ৺কাশী ভুবনেশ্বর প্রভৃতি নানা স্থানে যাইতে হয়। পরে তাঁহার সহিত আমাদের শেষ দেখা হয় খুব সম্ভব ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়। তখন তাঁহার শরীরে ক্ষয় রোগ প্রবেশ করিয়াছে, দুইজন সেবক সর্বদাই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তখন তিনি মঠের বর্তমান অফিস-ঘরের উপরতলায় থাকিতেন। তাঁহার সেবকগণ ও মঠের অন্যান্য সাধুরা তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতেন। দেখিতাম তখনও, ঐ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার সর্বদা হাসিমুখ। আমরা দূর হইতে আসিয়াছি বলিয়া খুঁটিনাটি করিয়া আমাদের সকল খবর লইলেন। তাঁহার শারীরিক খবর জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর যেরকম রেখেছেন সে রকমই আছি।"

ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার শরীর যায়।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

আমার ৺কাশী আসিবার পূর্বে খুব সম্ভব ১৯১৫ সালে যখন একবার বন্ধুগণসহ মঠে গিয়াছিলাম তখন কথাপ্রসঙ্গে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে লাটু মহারাজ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। আমাদের মধ্য হইতেই একটি ভক্ত তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, পূজনীয় লাটু মহারাজ এখন কোথায় ও কেমন আছেন ? তদুত্তরে তিনি তাঁহার স্বভাব অনুযায়ী একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তিনি এখন কাশীতে। যাও না তাঁকে একবার দেখে এসো। দেখবে সেই নিরক্ষর সাধুর মুখ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কিরূপ বেদ-বেদান্ত নির্গত হচ্ছে।"

ইহার পরে ১৯১৯ সালে ৺কাশী আসিয়াও পূজনীয় লাটু মহারাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তাঁহার শরীর থাকিতে তাঁহাকে একবারমাত্র দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

তখন আমি ৺কাশীতে আশ্রমের বাহিরে থাকিতাম ও নিত্য পূজনীয় হরি মহারাজের নিকটে আসিতাম। তিনিও ধীরে ধীরে আমার অন্তরে বৈরাগ্যের বীজ বপন করিতেছিলেন। যাঁহাদের সহিত প্রায়ই তাঁহার নিকটে আসিতাম তাঁহাদের কেহ কেহ পূজনীয় লাটু মহারাজের নিকটেও প্রায় প্রত্যহ যাইতেন ও আমাকেও তাঁহাদের সহিত সেখানে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। কিন্তু পূজনীয় হরি মহারাজের সঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে কিছুতেই আমার মন তখন সরিত না। অবশেষে বন্ধুগণের একান্ত পীড়াপীড়িতে একদিন পূজনীয় লাটু মহারাজের নিকটে উপস্থিত হইতে হইল। তখন তিনি কাশীতে হাড়ারবাগে থাকিতেন। যখন আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম তিনি একটি চাদর মুড়ি দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন ও

বিড়বিড় করিয়া কি বলিতেছেন। নিকটেই সেবকগণ তাঁহার রাত্রের খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। ও চারি পাশে কয়েকটি কুকুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমরা তাঁহার নিকট আসিলে তিনি শুধু "তোরা কে এলিরে?" বলিয়া আবার চুপ করিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইলেন। সেবকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনি যে কখন খাইবেন তাহার কোন ঠিক নাই। হয়তো বা রাত্রি দুইটাও হইতে পারে। কিন্তু সর্বদাই তাঁহার খাবার যথাসময়ে তৈরী করিয়া তাঁহার নিকটে রাখিতে হয়, নতুবা উহা সেই সময় না পাইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন।

ইহার কিছুদিন পরে পূজনীয় হরি মহারাজের আদেশে কলিকাতায় পাঠ সাঙ্গ করিতে আসিতে হইল। এখানে কিছুদিন পরে পূজনীয় হরি মহারাজের স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি পাইলাম। উহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে তাঁহার চিঠি লিখিবার পূর্বদিন পূজনীয় লাটু মহারাজের শরীর গিয়াছে। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, কি অদ্ভুত উৎক্রান্তি, না দেখিলে উহা বুঝান যায় না। তাঁহার শরীর যাইবার পর তাঁহাকে যখন স্নানাদি করাইয়া বসানো হইয়াছিল তখন তাঁহার প্রস্ফুটিত চক্ষু ও প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তিনি সকলকেই আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

কাশী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কথা পূজনীয় হরি মহারাজের ও অন্যান্য মহারাজের নিকটে অনেক শুনিতে পাইলাম; তখন তাঁহার শরীর থাকিতে এই অদ্ভুত সাধুটিকে আরও দুই একবার কেন দেখিতে যাই নাই ভাবিয়া অনুশোচনা হইয়াছিল।